দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

ভারত তার রত্নকে হারাল : মোদী

— পৃঃ ২৯

ইয়াকুবের ফাঁসি নিয়ে এত বিতর্ক কেন?

— পৃঃ ৩১

৬৭ বর্ষ, ৫০ সংখ্যা।। ১০ আগস্ট ২০১৫।। ২৪ শ্রাবণ - ১৪২২।। website : www.eswastika.com ।। ১৫ই আগস্ট বিশেষ সংখ্যা।।

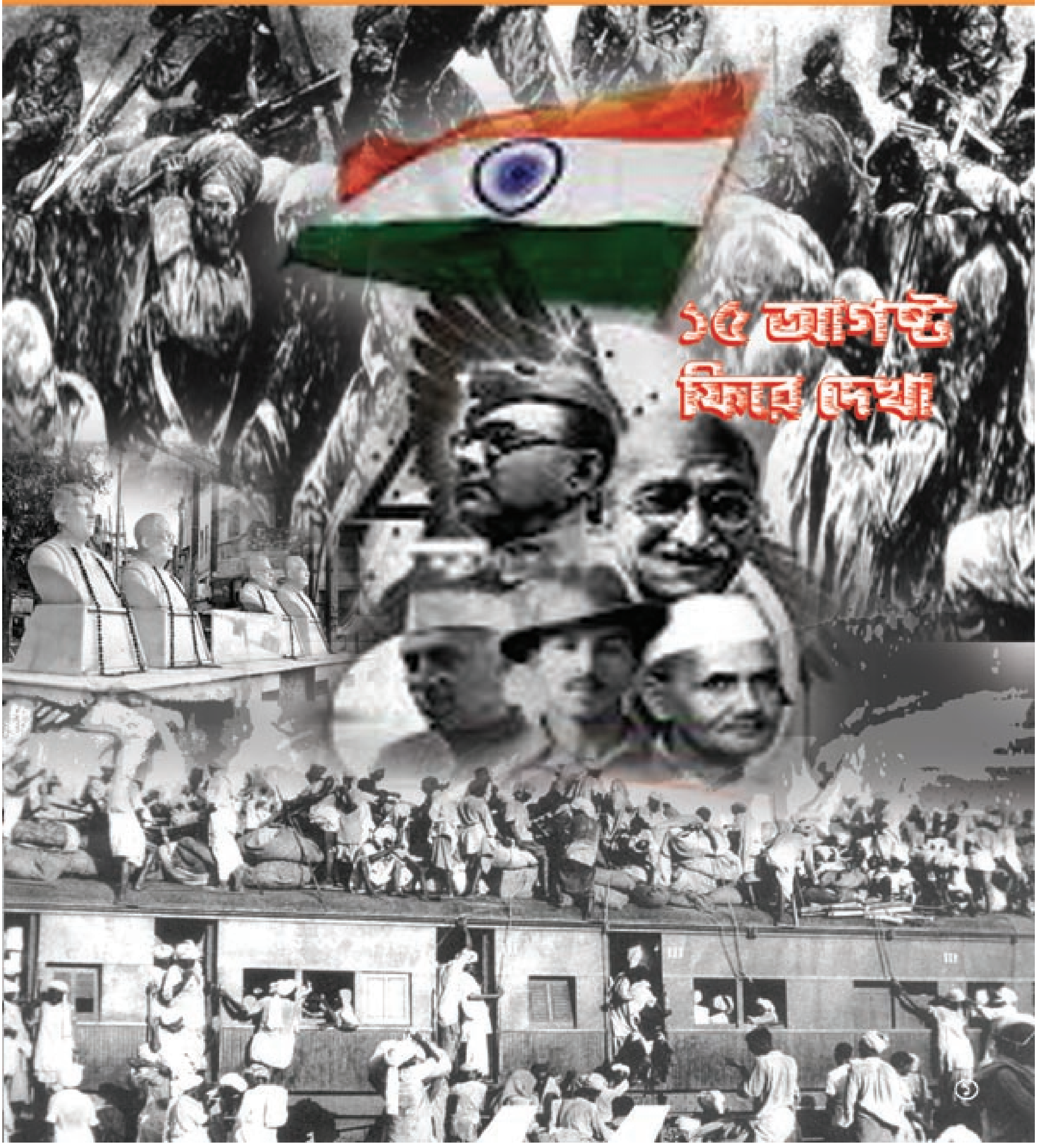

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৫০ সংখ্যা, ২৪ শ্রাবণ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
১০ আগস্ট - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015
R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮
খোলা চিঠি : হাওয়াই চটির ব্র্যাণ্ড অ্যাম্বাসাডর
▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯
ত্রিপুরার রাজ্যপাল সতর্কবাণী দিয়ে সঠিক কাজই করেছেন
▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০
ছেচল্লিশের দাঙ্গা — ফিরে দেখা ▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ১১
নিঃশব্দে চলে গেল শতবর্ষের ‘রডা’
▯ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৬
রাজধর্ম পালনে শক্তি প্রয়োগের অপরিহার্যতা
▯ নির্মলেন্দু চক্রবর্তী ▯ ২০
অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা শ্রী অরবিন্দ
▯ বি সি নাগ ▯ ২১
গুরুদাসপুরে জঙ্গি হামলায় আমরা হতচকিত
▯ কে পি এস গিল ▯ ২৭
ভারত তার রত্নকে হারাল ▯ নরেন্দ্র মোদী ▯ ২৯
ইয়াকুবের ফাঁসি নিয়ে এত বিতর্ক কেন ? ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯
অন্যরকম : ৩৩ ▯ সুস্বাস্থ্য : ৩৫
▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭▯ খেলা : ৩৯ ▯
শব্দরূপ : ৪০ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গ কি আবার ভাগ হতে চলেছে?

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ঠিক আগে বাংলার বেশিরভাগ এলাকা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। স্বাধীনতার ষাট বছর পরে আজ আবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সেইসব পুরনো সংকেত। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে কি আবার ভাগ হতে চলেছে? লিখেছেন — বিমল প্রামাণিক, বি পি সাহা, মোহিত রায় প্রমুখ।

সংরক্ষণযোগ্য সংখ্যা।। সত্বর কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ইয়াকুবের ফাঁসি এবং 'রুদালি'রা

ইয়াকুব মেমনের ফাঁসি হইবার কারণে দেশে আবার 'রুদালি'দের কান্না শুরু হইয়া গিয়াছে। এখন কিছু মানুষের বোধ হইতেছে গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্র কেন বাঁচিবার অধিকার কাড়িয়া লইবে? কেউ বলিয়াছেন বিজেপি সরকার বড় তড়িঘড়ি করিয়া এই সিদ্ধান্ত লইল। দাবি উঠিয়াছে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করিবারও। বলা হইতেছে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করিয়া কী ২৫০ জন নিহতের ক্ষতিপূরণ সম্ভব যাঁহারা ১৯৯৩ সালে মুম্বই বোমা বিস্ফোরণে মারা গিয়াছিলেন? এখন প্রশ্ন, দেশদ্রোহী ফাঁসির আসামিকে লইয়া কেন এই বিতর্ক? ইয়াকুব মেমনের কেন এই পরিণতি তাহা চিন্তা করিবার প্রয়োজন। যে অত্যন্ত স্থিরমস্তিষ্কে সুচিন্তিত পরিকল্পনায় ও সুদক্ষ পরিচালনায় ধারাবাহিক বিস্ফোরণে ২৫০ জনকে নিহত এবং সাতশোর বেশি মানুষকে আহত করিবার অন্যতম আসামী তাহার জন্য এত দরদ কিসের? তাহার ফাঁসিতে আজ কেন মড়াকান্নার ধুম পড়িয়া গিয়াছে? তাহার জন্য গুরুপাপে লঘুদণ্ডের কথা কেন? সারা দুনিয়ায় যখন উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি লওয়া হইয়াছে তখন আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ দেশে তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? এই অপরাধকে ক্ষমা করিবার অর্থ তো সেদিন যাঁহারা নিহত ও আহত হইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। সেদিন যাহাদের জন্য এতগুলি পরিবার অনাথ হইয়াছিল, পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে তাহাদের একজন অন্তত বিলম্বে হইলেও সাজা পাইয়াছে— ইহাই তো স্বজন হারানোরা দেখিলেন, আইন তাহাদের পাশে। এই ফাঁসি তাহাদের স্বস্তি দিয়াছে। নিন্দুকেরা বলিবেন প্রতিশোধের মানসিকতা, কিন্তু সেদিনের ব্যথার ক্ষত জুড়াইতে স্বজন হারানোরা নিজের হাতে আইন তুলিয়া লন নাই, আইনের প্রতি বিশ্বাস দেখাইয়াছেন। তাহার যে মূল্য রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পুলিশ প্রশাসনও কাজ করিয়া থাকে আইনের ভরসায়, সাজা হইলে ভরসার স্থানটি সুদৃঢ় হয়। যাহারা মানুষের বাঁচিবার অধিকার লইয়া লড়াই করিতে ভালোবাসেন তাঁহাদের জানা প্রয়োজন, যখন একজন মানুষ কোনো এক মানুষকে খুন করিয়া থাকে তখন সে আর মনুষ্যপদবাচ্য থাকিতে পারে না, অমানুষে পরিণত হইয়া থাকে। যে অন্যের প্রাণ হরণ করে তাহার নিজের প্রাণও তখন অনিশ্চিত হইয়া পড়ে— এটাই দার্শনিক সত্য। সুতরাং আজ ইয়াকুব মেমনের ফাঁসি লইয়া যাহা চলিতেছে প্রকারান্তরে তাহা সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়ারই নামান্তর।

আমাদের দেশে কংগ্রেস চিরকালই এই বিধর্মী সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিয়াছে। তাঁহাদের দুইজন নেতা সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হইলেও এই বিষয়ে শিক্ষা হয় নাই। আর বামপন্থীরা তো বিদেশের দালালি করিয়াই এই দেশে জলহাওয়া ভোগ করিতেছে। চীন এবং পাকিস্তানের দালালি তাহাদের চিরকালের ধর্ম। তবুও যে মানুষ এই বিদেশি দালালদের সহ্য করিতেছে, ইহাই ভারতীয় পরম্পরা। তবে যে সমস্ত সন্ত্রাসী গণহত্যায় নিরীহ মানুষের মৃত্যুর কারণ তাহাদের যত শীঘ্র এই পৃথিবী হইতে বিদায় করা যায় ততই মঙ্গল। যাহারা নিজেরা মানবিকতার মূল্য দেয় নাই তাহাদের জন্য মানবিকতার কি প্রয়োজন রহিয়াছে?

এই ফাঁসির জন্য বিজেপি-কে দোষারোপ করা কেন? বিজেপি এই সন্ত্রাসবাদীর বিচার করে নাই, বিচার করিয়াছে সুপ্রিম কোর্ট। এই দেশের সরকার বাইশ বছর ধরিয়া এই দেশদ্রোহী গণহত্যাকারীকে জনগণের করের অর্থে বহাল তবিয়তে বাঁচাইয়া রাখিয়া বিচারের ব্যবস্থা করিয়াছে মাত্র। ফাঁসিও হইয়াছে আইনজীবীদের সমস্ত বাদ প্রতিবাদের পর মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। গণতন্ত্রে যেমনটা হওয়া উচিত সরকার ঠিক তাহাই করিয়াছে। বিজেপি সরকার নাগপুরে মেমনের পরিবারকে উপস্থিত থাকিবার এবং তাহার শেষযাত্রায় মানুষকে যাওয়ার অনুমতি দিয়া ভারতীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মর্যাদা দিয়াছে। ইউপিএ আমলের আফজল গুরুর মতো পরিণতি হয় নাই মেমনের।

সুভাষিতম্

স্বম্ অর্থম্ যঃ পরিত্যজ্য পরার্থম্ অনুতিষ্ঠতি।
মিথ্যা চরতি মিত্রার্থে যঃ চ মূঢ় সঃ উচ্চতে।। (চাণক্যনীতি)

নিজের অর্থ চিন্তা না করে যে পরের কাজে লিপ্ত থাকে এবং বন্ধুর জন্য মিথ্যা আচরণ করে, তাকে মূঢ় বা মহামূর্খ বলা হয়।

বিহার বিধানসভা নির্বাচন

নীতিশ-লালুর সুবিধাবাদী জোটকে রুখতে পরিকল্পনা বিজেপি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভোটের ঢাকে কাঠি পড়েছে বিহারে। নীতিশ-লালু-কংগ্রেসের যে সুবিধাবাদী জোট তৈরি হয়েছে তা বিহারের মানুষ কতটা গ্রহণ করেন বা আদৌ করেন কিনা, তথ্যাভিজ্ঞমহল সেই দিকে খেয়াল রাখতে বলছেন। তবে একইসঙ্গে তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন বিহারের মানুষকে ভারতবাসী হিসেবে ভাবার সুযোগ না দিয়ে এই সুবিধাবাদী জোট ফের জাতপাত ভিত্তিক নোংরা রাজনীতি চালু করে ভোট-পরিস্থিতিকে অশান্ত করে তুলবে। স্বাভাবিকভাবেই জনমতের ওপর গভীর আস্থা পোষণ করেও ভোট-কৌশল ঠিক করতে আসরে নেমে পড়েছে বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ ও তাঁর সহযোগীরা। ইতিমধ্যেই গত ২৫ জুলাই বিহারের মুজফ্‌ফরপুরে ভোট প্রচারে গিয়ে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁকে নিয়ে মাথাব্যাথার কারণেই বিজেপি-র সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন নীতিশ কুমার। তারপর লোকসভা ভোটে মুখ থুবড়ে পড়ে তাঁর দল। এমনকী জিতনরাম মাঝির হাতে দায়িত্ব ছেড়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগেও বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। তারপরেও সেই কুর্সির মোহেই রাজ্যপাট একপ্রকার জবরদখল-ই করেছেন নীতিশ। এবার বিধানসভা নির্বাচনে হাল খারাপ বুঝে লালু- কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে যে সুবিধাবাদী জোট গড়ে কুর্সি দখলে রাখতে চাইছেন তিনি তা যে বিশেষ ফলপ্রসূ হবে না— এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

তবে রাজ্যের জনগণের ওপর সব ভার দিয়ে বসে থাকতে নারাজ বিজেপি। তারা বিহারের ২৪৩ টি বিধানসভা আসনকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে। প্রথম ভাগে পড়ছে সেই আসনগুলি যেখানে বিজেপি পরম্পরাগতভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। এখানে মূলত স্থানীয় নেতা ও কর্মীদের ওপরেই আস্থা রাখছেন বিজেপি নেতৃত্ব। এঁদের দ্বারাই ভোটপর্ব উতরে যাবে বলে অমিত শাহের সহযোগীরা আশা করছেন। এখানে কেন্দ্রীয় বা রাজ্যস্তরের তাবড় নেতারা কম দেখা দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, এমন বহু আসন চিহ্নিত হয়েছে যেখানে বিজেপি-বিরোধী শক্তি তীব্র লড়াই দিতে পারে। এখানে প্রার্থী বাছাইকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে জোর দেওয়া হবে। এমন প্রার্থী নির্বাচনের চেষ্টা চলছে যাতে তিনি সবধরনের মানুষের, সব জাতপাতের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেন। জাতপাতের রাজনীতিতে সার্বিক গ্রহিষ্ণুতাকেই মূলধন করছে বিজেপি। তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে সেই আসনগুলি যেখানে বিজেপি বেশ কমজোরি। এক্ষেত্রে কোনো গ্রহণযোগ্য প্রার্থী, তা তিনি দলের সদস্য নাও হতে পারেন, তাঁকেই সামনে রেখে নির্বাচনে লড়ার পরিকল্পনা বিজেপি-র। এছাড়াও থাকছে ভোট যোগাড়ের অন্যান্য উপকরণও। যেমন ভিডিও-র মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তৃতার নির্ধারিত অংশ এবং ১৯৯০-এর সময়ে লালুর আমলের বিহারের আইন-শৃঙ্খলার শোচনীয় অবস্থার ভিডিও প্রদর্শন। সেইসঙ্গে ২০১০-এ নির্বাচনী জনসভায় লালুর বিরুদ্ধে নীতিশের ব্যঙ্গোক্তির ভিডিও ফুটেজও। পাশাপাশি বিহারে দলীয় সংগঠনকে আরও মজবুত করার চেষ্টা চলছে। পাটনায় একটি কল-সেন্টার চালু করা হয়েছে। নেতাদের সঙ্গে কর্মী সংযোগ আরও বাড়ানো এর লক্ষ্য। এই কল সেন্টারের মাধ্যমে সুশীল মোদী, বিহার বিজেপি-র সভাপতি মঙ্গল পাণ্ডে এবং বিরোধী দলনেতা নন্দকিশোর যাদবের মতো শীর্ষস্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব নিয়মিত ১০০০ সক্রিয় বিজেপি-কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। লালু- নীতিশের জোট যে কতটা সুবিধাবাদী এবং এই আঁতাত যে আসলে ক্ষমতার মধু উপভোগের তাগিদেই তা বিহারবাসীকে বোঝাতে কৌশল নিচ্ছে বিজেপি।

লন্ডনে মমতা ব্যানার্জীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মমতা ব্যানার্জীর সপার্ষদ লন্ডন সফরকালে ৩০ জুলাই ৬৩, নিউ ক্যাভেনডিস স্ট্রিটে অবস্থিত এশিয়া হাউসে রাজকুমার অ্যান্ড্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ

করতে গিয়ে সেখানে প্রবাসী ভারতীয় বাঙালিদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন মমতা ব্যানার্জী ও অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। লন্ডনে বাসরত একজন প্রবাসী বাঙালি জানাচ্ছেন, এশিয়া হাউসের সামনেই পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে প্রায় ডজনখানেক পোস্টার নিয়ে শ্লোগান দিতে থাকেন বিলেতে বসবাসরত ভারতীয়রা। পোস্টারগুলির শিরোনামগুলি মূলত ছিল পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সমস্যাগুলি নিয়ে : 'ভারতের সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্রস্থল পশ্চিমবঙ্গ', 'মানব পাচার বন্ধ কর', 'পশ্চিমবঙ্গের কন্যারা অপহৃত, গণধর্ষিত এবং বিক্রি হচ্ছে কেন?' 'পশ্চিমবঙ্গ এক জলজ্যান্ত নরক', 'মমতা ব্যানার্জীর পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের অর্থ সন্ত্রাসবাদে বিনিয়োগ করা' ইত্যাদি। উল্লেখ্য, দৈনিক পত্রিকা 'আজকাল'-এ প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে বিক্ষোভ প্রদর্শনকে অগ্রাহ্য করে অমিত মিত্র-সহ মমতা ব্যানার্জী সোজা 'এশিয়া হাউস'-এ ঢুকে যান। এবিষয়ে রাজীব চক্রবর্তী লিখিত প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন

দেশে এন জি ও-র সংখ্যা ছাড়াল ৩১ লক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এই মুহূর্তে দেশে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এন জি ও)-র সংখ্যা ৩১ লক্ষ। এই সংখ্যাটি সারা দেশের স্কুলের সংখ্যার দ্বিগুণ। সরকারি হাসপাতালের সংখ্যার আড়াইশো গুণ। এবং দেশের ৭০৯ জন মানুষপিছু পুলিশের সংখ্যা যেখানে একজন, সেখানে মাত্র ৪০০ জন দেশবাসী পিছু এন জিও-র সংখ্যা একটি। এমনই তথ্য উঠে এসেছে সিবিআই-এর সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায়। দেশের সবকটি রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টে নথিবদ্ধ এনজিও-র সংখ্যা সিবিআই তাদের সমীক্ষায় পেশ করেছে। সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি সিবিআই-কে নির্দেশ দিয়েছে এই এনজিও-গুলো সম্বন্ধে তথ্য জোগাড় করতে। বিশেষ করে এরা বিগত ও চলতি অর্থ-বর্ষের আয়-ব্যয়ের হিসাব সমেত ব্যালান্সশিট জমা দিয়েছে কিনা এবং এদের গ্রহণযোগ্যতা কতদূর রয়েছে।গত ৩১ জুলাই সিবিআই দেশের সর্বোচ্চ আদালতে জমা দেওয়া হলফনামায় জানিয়েছে ভারতের ২৬টি রাজ্যে এনজিও-র সংখ্যা প্রায় ৩১ লক্ষ। কর্ণাটক, ওড়িশা এবং তেলেঙ্গানায় এনজিও-র সঠিক সংখ্যা সিবিআই এখনও নিরূপণ করতে পারেনি। সুতরাং সবমিলিয়ে এনজিও-র সংখ্যা যে ৩১ লক্ষ ছাড়াবে তা স্পষ্ট। পাশাপাশি, সিবিআইয়ের হিসাবে সাতটি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে নথিবদ্ধ এনজিও-র সংখ্যা ৮২,৫০০। কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে স্রেফ দিল্লীতেই এই সংখ্যা ৭৬,০০০ ছাড়িয়েছে। রাজ্যগুলির মধ্যে এনজিও-র সংখ্যার নিরিখে প্রথম স্থানে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ। দেশের সর্ববৃহৎ রাজ্যে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংখ্যা ৫.৪৮ লক্ষেরও বেশি। এরপর রয়েছে যথাক্রমে মহারাষ্ট্র (৫.১৮ লক্ষ) কেরল (৩.৭ লক্ষ), পশ্চিমবঙ্গ (২.৩৪ লক্ষ) প্রভৃতি।

২০১১ সালে দেশের প্ল্যানিং কমিশন যে তথ্য প্রকাশ করেছিল তাতে দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক— সব ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫ লক্ষ। অর্থাৎ এনজিও-র সংখ্যার অর্ধেকেরও কম। অন্যদিকে ২০১১-র মার্চের তথ্য দেশে হাসপাতালের সংখ্যা ১১,৯৯৩। শয্যার সংখ্যা ৭.৮৪ লক্ষ। বলাই বাহুল্য, এই সংখ্যা দেশের এনজিও সংখ্যার ধারে কাছে পৌঁছচ্ছে না। অন্যদিকে ২০১৪-য় প্রকাশিত ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর তথ্য বলছে সারাদেশে এই মুহূর্তে পুলিশকর্মীর সংখ্যা ১৭.৩ লক্ষ এবং সশস্ত্রবাহিনীর জওয়ানের সংখ্যা ১৩ লক্ষ। এই দুই মিলিত সংখ্যাও দেশের এনজিও সংখ্যাকে ছুঁতে পারছে না।

যাই হোক, দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে সরকারের তুলনায় বেসরকারি উদ্যোগের এই বাড়বাড়ন্ত ভারতবর্ষের কোনো প্রয়োজনে লাগছে কিনা তা নিয়ে সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন উঠছে। কারণ ৩১ লক্ষ এনজিও-র মধ্যে মাত্র ২.৯ লক্ষ এনজিও তাদের আয়-ব্যয়ের খতিয়ান পেশ করেছে। কেরলে ৩.৭ লক্ষ এনজিও-র মধ্যে একটিও এই হিসাব পেশ করেনি। পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্রে মাত্র ৭ শতাংশ এন জি ও তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব জমা দিয়েছে। দেশের অন্যান্য রাজ্যেও এই পরিস্থিতি বিশেষ সুবিধার নয়। সুতরাং এনজিও-গুলির উদ্দেশ্য, সততা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয় বলেই মনে করছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল। বরং ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা এনজিও-গুলির কোনো অসৎ উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা তা এখন সিবিআই-র মাথাব্যথার কারণ।

সিবিআই সর্বোচ্চ আদালতে জানিয়েছে আগামী দু'মাসের মধ্যে কর্ণাটক, ওড়িশা ও তেলেঙ্গানায় এনজিও সংক্রান্ত তথ্য হাতে চলে এলেই তারা এ সংক্রান্ত যাবতীয় পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারবে। আদালত চলতি সপ্তাহেই আইনজীবী এম এল শর্মার জনস্বার্থের শুনানিটি গ্রহণ করতে চলেছে। যিনি বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবগ্রস্ত এনজিও-গুলির সিবিআই তদন্তের দাবিতে সরব হয়েছেন।

পাকিস্তানের সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৩ সাল থেকে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান ১,১৪০ বার সীমান্তে গোলাগুলি চালিয়েছে। অবশ্য বেশিরভাগ সময়েই এই গুলি চালনার ঘটনা লাইন অফ কন্ট্রোল (এল ও সি) থেকে আন্তর্জাতিক সীমানা (আই বি)-র ওপার থেকেই বেশি ঘটেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পারিক্কর রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে জানান যে ২০১৩-তে ৩৪৭ বার, ২০১৪-তে ৫৮৩ বার ও ২০১৫-র ৩০ জুন পর্যন্ত ১৯৯ বার সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান, যার মধ্যে প্রায় ১৫ বারই এল ও সি-এর ওপার থেকেই গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এল ও সি এবং আন্তর্জাতিক সীমানা (আই বি) রক্ষিত হয় যথাক্রমে আর্মি এবং বি এস এফ দ্বারা। ভারত বারবার বলে এসেছে ভারত-পাক সম্পর্কের উন্নতির জন্য আই বি এবং এল ও সি বরাবর 'সিজফায়ার কমিটমেন্ট-২০০৩' মান্য করার কথা। কিন্তু বলাই বাহুল্য পাকিস্তান বারবারই তা অমান্য করেছে। আগামী মাসে জাতীয় সুরক্ষা সংস্থাগুলির আলাপ আলোচনার পর বি এস এফ ও পাকিস্তান রেঞ্জার্সের ডিজিএমও স্তরে দু'দেশের সম্পর্ক নিয়ে কথাবার্তা হবে। উল্লেখ্য, ২০১৩-এর ডিসেম্বরে শেষবারের মতো ওয়াঘা-আটারি সীমান্তে দু'দেশের ডিজিএমও-দের বৈঠকের পরে অনুপ্রবেশ ও সীমান্তে গুলি চালানোর ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল।

৮৫৭টি পর্নোসাইট বন্ধ করল সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি সরকারের পক্ষে টেলিকম ব্যবসায়ী ও ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে ৮৫৭টি অশ্লীল সাইট এবং ইউ টোরেন্ট সাইট বন্ধ করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করার ক্ষেত্রে এই আদেশকে অপ্রয়োজনীয় সরকারি হস্তক্ষেপ আখ্যা দিয়ে প্রতিবাদও প্রত্যাশিতভাবে নজরে এসেছে। নাগরিকদের চার দেওয়ালের ব্যক্তিগত পরিসরে প্রাপ্তবয়স্ক বিষয়বস্তুর যে-কোনো ওয়েবসাইটে যাওয়ার স্বাধীনতাকে খর্ব করার এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।

সরকারি সূত্র অনুযায়ী কখনই সামগ্রিকভাবে প্রাপ্তবয়স্ক চ্যানেলগুলি নিষিদ্ধ করার ফতোয়া দেওয়া হয়নি। কেবলমাত্র শিশুদের কেন্দ্র করে যে সমস্ত অশ্লীল প্রদর্শন চলছে সেগুলিকে আটকাবার সুস্থ অভিপ্রায়েই এই সাময়িক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গোটা টেলিকম পরিষেবাকে ঢেলে সাজাবার প্রথম স্তর হিসেবে এই পদক্ষেপ। সূত্রে প্রকাশ, সম্প্রতি সর্বোচ্চ আদালত গৃহমন্ত্রকের শিশু পর্নোগ্রাফির প্রদর্শন বন্ধ রাখার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কৈফিয়ত চাওয়ার ভিত্তিতেই এই চটজলদি নির্দেশ জারি করা হয়েছে। কোনো মতেই এই পদক্ষেপ ব্যক্তিগত শয়নকক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের নিজস্ব অধিকারে হস্তক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়নি। অবশ্য টেলিকম সংস্থাগুলির (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) কর্তারা জানাচ্ছেন এক ধাক্কায় সবকটি এই ধরনের সাইটকে বন্ধ করা যায়নি। তাঁদের মতে, এক একটি করে সাইট বন্ধের কাজ সারতে কয়েকদিন লাগবে।

এদিকে সরকার সারা বিশ্বে চালু থাকা পর্নোসাইটের মডেলগুলি পর্যালোচনা শুরু করে উপযুক্ত পথ বের করার কথা ভাবছে। এর ফলে পর্নোপ্রেমীদের মধ্যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে সরকার হয়তো শিশু যৌন নিপীড়নের দোহাই দিয়ে ওয়েব দুনিয়া থেকে 'পর্নোসাইট'-ই না ছেঁটে ফেলে। এই সূত্রে তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া সাবধানবাণী— 'নাগরিককে কখনই তার শয্যাগৃহের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ওয়েবসাইট দেখার ব্যক্তিগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না— এটি স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলছেন না।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক সূত্র অনুযায়ী সরকারের মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ্য স্থানে যেমন সাইবার কাফে বা পার্লার ইত্যাদিতে অশ্লীল সাইটগুলির খুল্লামখুল্লা প্রদর্শন আটকানোর রাস্তা খুঁজে বের করা। তাই সরকারের লক্ষ্য 'নিয়ন্ত্রণ', কখনই বন্ধ বা 'নিষিদ্ধ' করে দেওয়া নয়। এই মর্মে সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, 'কোনো ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত পরিসরে পর্নোসাইট দেখতেই পারেন। এখানে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী যাতে শিশুরা কোনোভাবেই বিষয়বস্তুর অংশ না হয়ে পড়ে তা সরকার নিশ্চিত করবে।'

সংবিধানের ১৯ (২) ধারায় সরকারের হাতে দেশের দৃশ্য মাধ্যমগুলিতে অন্যান্য অনেক কিছুর মতো শ্লীলতা নৈতিকতার মান বজায় রাখার যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সরকার তা পালন করেছে মাত্র।

আন্দামানের সেলুলার জেলে বীর সাভারকর স্মরণে 'স্বতন্ত্র্য জ্যোতি' প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ভূমিপূজনের সূচনা করছেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল রাম নায়েক। সঙ্গে রয়েছেন আন্দামান ও নিকোবরের রাজ্যপাল এ কে সিং, সাংসদ রাহুল শেওয়ালে এবং অন্যান্যরা।

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

হাওয়াই চটির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
নবান্ন, হাওড়া

দিদি, লন্ডন সফরের অভিনন্দন নেবেন। আপনি দেখিয়ে দিলেন দিদি। কলকাতা থেকে সাহেবরা অনেকদিন বিদায় নিয়েছে। কিন্তু সাহেবি ক্লাবগুলো এখনও আমাদের নেটিভ মনে করে। হাওয়াই চটি দূরস্থান, বুটজুতো, গুঁজে জামা-প্যান্ট মানে পুরো সাহেবি পোশাক ছাড়া ঢুকতেই দেয় না। আর আপনি কিনা টেমস নদীর পাড় কাঁপিয়ে দিলেন হাওয়াই চটির চটাস চটাসে। এমনকী বৃটিশ রাজবাড়িতেও হন হন করে ঢুকে পড়লেন। টক টক করে ইংরেজি বললেন। আপনার আঁকা ছবি বিলি করলেন। এমনকী গড়িয়াহাটের জামা উপহার দিয়ে এলেন রাজপুত্র, রাজকন্যেদের। দিদি আপনার জবাব নেই! হাওয়াই চটির যে প্রচার করলেন তাতে আপনাকে সব হাওয়াই চটির কোম্পানি মিলে 'হাওয়াই চটির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর' ঘোষণা করা উচিত। এমনকী আমার তো মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি আপনাকে হাওয়াই দ্বীপের রানি ঘোষণা করা উচিত। হুনুলুলুতে হবে হাওয়াই উৎসব।

আচ্ছা দিদি, আপনি মোট ক' জোড়া হাওয়াই চটি নিয়ে গিয়েছিলেন? আসলে কাগজে ছবি দেখলাম আপনি একদিন টেমসের পাড়ে সাদা স্ট্র্যাপের চটিতে আবার একদিন নীল স্ট্র্যাপের। তবে চটির রং যাই হোক বৃটিশরা দেখল বাঙালি মেয়ের রংবাজি।

আমি ভাবছি, দিদি আপনি যদি এবার কোনো একটা পুজো সংখ্যায় লন্ডন সফর নিয়ে একটা ভ্রমণ কাহিনি লেখেন তবে খুব ভালো হয়। আসলে লন্ডন নিয়ে আমার অনেক প্রশ্ন। আপনার কথাতেই কাগজ পড়ে শুনলাম, ওখানেও নদীর পাড়ে ময়লা। আচ্ছা দিদি, ওখানে কি টেমসের পাড়ে আমাদের এখানের মতো সাহেবরা প্যান্ট গুটিয়ে মলত্যাগ করতে বসে?

দিদি ভ্রমণ কাহিনিতে কিন্তু এটাও লিখবেন যে, লন্ডন শহরের রাস্তাঘাট মূলত হকারদের। লোকজন হাঁটতেই পারে না। আপনি যেদিন হেঁটেছিলেন সেদিনটা পুলিশ দিয়ে ফাঁকা করা হয়েছিল। আর দিদি, ওখানেও অটোর দৌরাত্ম দেখলেন? বাসের রেষারেষি?

লিখবেন দিদি, লিখবেন। আপনার ভ্রমণ কাহিনিতে সব লিখবেন। পুলিশের কথাও লিখবেন। সিনেমায় দেখেছি ওদের খুব সুন্দর দেখতে। আচ্ছা শাসকদলের বাইকবাহিনী যখন ওদের পেটায় তখন ওদের কেমন দেখতে লাগে? পুলিশ কি খুচরোয় ঘুষ খায় না পাউন্ডে?

দিদি, শুনেছিলাম আপনি ওখানকার একটা কি যেন নামের ইউনিভার্সিটিতে ভাষণ দেবেন। তারপর দেখলাম দিলেন না। কেউ কেউ বলছিল আপনি নাকি আমন্ত্রণ পত্রটাই হারিয়ে ফেলেছেন। আচ্ছা দিদি, সবাই তো আমাদের খালি গালাগাল দেয়। কিন্তু ও দেশেও কি তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্ররা শিক্ষকদের পেটায়? ও সরি, ওখানে তৃণমূল কোথা থেকে আসবে! আসলে রাজ্যে এখন সব কিছুতেই তৃণমূল দেখতে দেখতে আজকাল মনে হয় গোটা পৃথিবীটাই বুঝি তৃণমূল কংগ্রেসের সাম্রাজ্য।

যাক দিদি, আপনি তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছেন ভালো হয়েছে। সত্যি অমন বিলিতি দেশে বেশি দিন ভালো লাগে নাকি! খাওয়া দাওয়া, কথা বলা সবেতে সমস্যা। অনেকে মানে আপনাকে যারা দেখতে পারে না তারা বলছে, আপনি নাকি ভেবেছিলেন অনেক শিল্পপতি আপনার দরজার সামনে লাইন দেবে। কিন্তু স্বরাজ পল ছাড়া কেউ আসেনি দেখে আপনি পালিয়ে এসেছেন। একটু যে ঘুরে বেড়াবেন তারও তো জো নেই। অমনি সবাই বলবে কাজকর্ম ফেলে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের প্রমোদ ভ্রমণে বেড়িয়েছেন।

আপনি দিদি, লন্ডন ভ্রমণ কাহিনির শেষ প্যারায় হিসেবটা দিয়ে দেবেন। যত সব বিরোধীদের থোতামুখ ভোঁতা হয়ে যাবে। দেখিয়ে দেবেন কোষাগারের কত টাকা খরচ হয়েছে আর কত টাকার শিল্প আসছে। আর যদি সেই হিসেবে গরমিল থাকে তবে পরিষ্কার বলে দেবেন, দেব না। হিসেব দেব না। ওরে হতচ্ছাড়া বাঙালি, তোরা শুধু টাকাটাই বুঝলি! একটা বাঙালির মেয়ে মাথা উঁচু করে কড়া প্রোটকলের বৃটিশ রাজবাড়িতে হাওয়াই চটি আর ধনেখালি তাঁত পরে যে ড্যাং ড্যাং করে ঢুকে গেল সেটা দেখলি না। শুনে রাখ, এটা বিনয়-বাদল- দীনেশদের থেকে কিছু কম বিপ্লব নয়। হেস্টিংস, কার্জনরা ওপরে বসে নিশ্চিত ভাবছিল, 'ভাগ্যিস দিদি ছিল না সেই কালে।'

যাই হোক দিদি, রাজ্যে বন্যা হতে পারে দেখে আপনি চলে এলেন তাতেও ট্রেনে বাসে টিটকিরির অভাব নেই। যারা টিটকিরি দিচ্ছে তাদের কিন্তু লোকাল এরিয়ায় আপনার ক্যাডারবাহিনী দেখলেই ল্যাজ গুটিয়ে যায়। যাই হোক বলছে, তিনি এলেন, দুর্যোগ এল। ম্যান মেড বন্যা আর ওম্যান মেড ধরনা। এবার নিশ্চয়ই আপনি বন্যা হয়েছে টাকা দাও, লন্ডন ঘুরে অনেক খরচা হয়েছে বলে কেন্দ্রের কাছে ধরনা দেবেন! নিশ্চয়ই দেবেন। এটা আপনার হক।

— সুন্দর মৌলিক

ত্রিপুরার রাজ্যপাল সতর্কবাণী দিয়ে সঠিক কাজই করেছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মুম্বই বিস্ফোরণের অন্যতম প্রধান চক্রী ইয়াকুব মেমনের ফাঁসিকে ঘিরে এক শ্রেণীর মানুষ অযথা বিতর্ক শুরু করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, দেশের বিচার ব্যবস্থা থেকে ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ড বাতিল করা উচিত। কারণ, চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত কোনো সভ্য সমাজের রীতি হতে পারে না। যাঁরা এসব কথা বলছেন তাঁরা জানেন ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় অপরাধীদের সহজে ফাঁসি দেওয়া হয় না। মুম্বইয়ের অপরাধ জগতের একদা বেতাজ বাদশা দাউদ ইব্রাহিমের অতি বিশ্বস্ত ডান হাত ছিল টাইগার মেমন এবং তার ভাই ইয়াকুব আবদুল রজাক মেমন। দাউদ, টাইগার এবং ইয়াকুব ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে মুম্বই মহানগরীতে বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় শক্তিশালী বোমা রেখে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটায়। এই বিস্ফোরণে কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ইয়াকুবের সাফাই ছিল বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের প্রতিশোধ নিতে তারা মুম্বইতে হিন্দু নিধনের জন্য বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছিল। কিন্তু বিস্ফোরণে মৃতদের অনেকেই ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ।

ইয়াকুবের ফাঁসি নিয়ে যে বিতর্কটা উঠতে পারতো তা' হলো একজন নৃশংস খুনিকে মৃত্যুদণ্ড দিতে ২২ বছর সময় লাগানো কেন? এর কারণ, ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির সংশোধন। ১৯৭৩ সালে ফৌজদারি দণ্ডবিধির সংশোধন করে বলা হয় যে একমাত্র বিরলতম অপরাধের ক্ষেত্রেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। সাধারণ নরহত্যার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডই হবে উপযুক্ত শাস্তি। মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে বিচারককে নিশ্চিত হতে হবে অপরাধটি বিরলতম। 'রেয়ারেস্ট অব রেয়ার।'

মুম্বইয়ের টাডা আদালতে দীর্ঘকাল ধরে বিচার চলাকালে সাক্ষ্য প্রমাণ এবং ইয়াকুবের স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্ট হয় যে বাবরি ধ্বংসের কারণে মুম্বইতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তার বদলা নিতে শহরজুড়ে বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করে দাউদ। এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় টাইগার এবং ইয়াকুবকে। অপরাধের পর তারা দাউদের

গূঢ় পুরুষের কলম

পরিবারের সঙ্গে প্রথমে দুবাই এবং পরে পাকিস্তানে পালিয়ে যায়। ইয়াকুবের স্ত্রী ও কন্যা পড়ে থাকে মুম্বইতে। পাকিস্তানে থাকাকালে ভারতীয় গোয়েন্দারা ইয়াকুবের সঙ্গে যোগাযোগ করে আশ্বাস দেয় যে তদন্তে সহযোগিতা করলে তার স্ত্রী ও কন্যাকে পাকিস্তানে যেতে দেওয়া হবে। ভারতীয় গোয়েন্দাদের টোপ সহজেই গিলে ফেলে ইয়াকুব। ঠিক হয় নেপালের কাটমাণ্ডুতে এসে ইয়াকুব গোয়েন্দাদের মুম্বই ষড়যন্ত্রের নেপথ্য তথ্য দেবে। এরপর ইয়াকুব কাঠমাণ্ডুতে এলে গোয়েন্দারা তাকে গ্রেপ্তার করেন। তাই বিবেক দংশনের জন্যই ইয়াকুব পাকিস্তান থেকে চলে এসে স্বেচ্ছায় মুম্বই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল তার আইনজীবীদের এই দাবি অসত্য।

ইয়াকুবের ফাঁসি দিতে দীর্ঘ কয়েক বছর কেটে যায় আদালতে আইনি লড়াইতে। টাডা কোর্টে ফাঁসির রায় হওয়ার পর ইয়াকুবের আইনজীবীরা আপিল নিয়ে মুম্বই হাইকোর্টে যান। হাইকোর্টও ইয়াকুবের অপরাধকে 'রেয়ারেস্ট অব রেয়ার' ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে। আইনজীবীরা হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যান। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা কয়েকটি তথ্যের পুনর্বিচার করার নির্দেশ দিয়ে মামলাটি টাডা কোর্টে ফেরত পাঠায়। বেশ কয়েক বছর টাডা কোর্ট এবং মুম্বই হাইকোর্ট ঘুরে মামলাটি পুনরায় সুপ্রিম কোর্টে আসে। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে দীর্ঘ শুনানির পর ইয়াকুবের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হয়। ইয়াকুব ক্ষমাভিক্ষা করে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানায়। তখন কেন্দ্রে কংগ্রেসের ইউপিএ সরকার। ইয়াকুবকে ফাঁসি দিলে কংগ্রেস মুসলমান ভোট হারাতে পারে এই আশঙ্কায় তার ক্ষমাভিক্ষার আবেদনটি ফাইল চাপা দেওয়া হয়।

এরপর দিল্লীতে রাজনৈতিক পালা বদল হয়। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি-র এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়ে দেন যে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই ইয়াকুবের অপরাধ বিরলতম ঘটনা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পরামর্শে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ইয়াকুবের প্রাণভিক্ষার আবেদন খারিজ করেন। এরপরেও ইয়াকুবের আইনজীবীরা হাল ছাড়েন না। তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের তিন বিচারপতির বেঞ্চে প্রাণভিক্ষার আবেদন নিয়ে যান। মধ্যরাত্রে সুপ্রিম কোর্টের দরজা খুলে বিচার শুরু হয়। প্রায় দু' ঘণ্টা শুনানির পরে তিন বিচারপতি এক মত হন যে ইয়াকুবের অপরাধ ফাঁসিরই যোগ্য। এরপরেই নাগপুরের জেলে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় সঠিকভাবেই বলেছেন যে ইয়াকুবের অন্তিম যাত্রায় যে সব অপরিচিত মুখ দেখা যায় তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া দরকার। সত্যিই দরকার। কারণ, ইসলামিক স্টেট বা আই এস জঙ্গিরা প্রতিশোধ নিতে আঘাত হানতে প্রস্তুত হচ্ছে। তার প্রমাণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে ত্রিপুরা-সহ মোট ১২টি রাজ্যকে সতর্ক করেছে। তাই ত্রিপুরার রাজ্যপাল সতর্কবাণী দিয়ে সঠিক কর্তব্যই করেছেন।■

ছেচল্লিশের দাঙ্গা—ফিরে দেখা

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

মিজানুর রহমানের 'কৃষ্ণ ষোলই' পড়লাম। ১৯৩১-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি জন্ম; ১৯৪৬-র ১৬ আগস্ট তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছরের সামান্য বেশি। মানিকতলা বাজারের কাছে থাকতেন। পড়তেন মিত্র ইনসটিটিউশনে। বন্ধুবান্ধব প্রায়ই হিন্দু, পাড়াটিও হিন্দু প্রধান। সকালে তার দাদা অভ্যাসবশত খবরের কাগজ না পেয়ে পাঠালেন মানিকতলা বাজারে। দাদা তখন স্কটিশচার্চ কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। বাবা ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে। একটি অস্ত্রোপচারের অপেক্ষায়। কয়েকদিন আগে থেকে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব Direct Action Day হিসাবে পালনের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি নিয়েছিল। বাংলা তখন মুসলিম লীগের দ্বারা শাসিত— প্রধানমন্ত্রী সাহেদ সোহরাবর্দি। সরকারি ছুটি দেওয়া হয় সেদিন। সরকারি ছুটি দেওয়া নিয়ে বিধানসভায় আপত্তি তুলেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু মহাসভার বিভিন্ন নেতা। তাঁদের কথা ছিল সরকারি ছুটি থাকলে চাকরিজীবীরা কর্মস্থলে আসেন না, মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকরা যথেচ্ছাচার করার সুবিধা পাবে। আর মুসলিম লীগ যেহেতু 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর ডাক দিয়েছে— সেদিন তাদের কর্মসূচি বেলাগাম হবার সম্ভাবনা। আর সরকারকে পৃথক রাখার দাবি তুলেছিলেন তারা। সেই প্রস্তাব ৩১-১৩ ভোটে পরাস্ত হয়। মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন ১১ আগস্ট যে বিবৃতি প্রচার করেন, তাতে তাদের মনোভাব সুস্পষ্ট। সামান্য উল্লেখ করছি :

"শতাধিক প্রক্রিয়ায় আমরা অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারি— বিশেষত আমাদের উপর যখন অহিংসার বন্ধন নেই। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অর্থ কি হবে তা বঙ্গের মুসলিম অধিবাসীরা জানেন এবং তাই তাঁদের সম্বন্ধে নেতৃত্ব দিতে যাবার আবশ্যকতা নেই।"

এরকম প্ররোচনামূলক বক্তৃতা অনেকেই দিচ্ছিলেন। একজন স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'একমাত্র রক্তপাতের মাধ্যমেই পাকিস্তান অর্জিত হতে পারে'। পরিস্থিতি যে কেমন দাঁড়িয়েছিল তা মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের বিচিত্র অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপে লক্ষিত হয়েছে। একটু উল্লেখ করা যাক :

▯ কয়েদ-এ-আজম মুহম্মদ আলি জিন্নাহ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ব্যাপারে কোন স্তরে হুঙ্কার দিয়েছিলেন তা বোঝা যাবে তাঁর এই উক্তিতে--- 'Today we have also forged a pistol and we are in a position to use it.' কলকাতাই যে তাদের লক্ষ্য তা বুঝতে পারি। কারণ ওইদিন কলকাতায় ভয়ঙ্কর হাঙ্গামা 'serious trouble' ঘটাতে তিনি কর্মীদের উৎসাহিত করেন। ২ আগস্ট সাংবাদিকদের প্রতি তাঁর কথা— 'I' am not going to discuss ethics.' জিন্না সাহেবই কলকাতাকে ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন।

▯ ৫ আগস্ট মুসলিম ইনসটিটিউটে নাজিমুদ্দিনের ডাকে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড-এর বড় বড় সমাবেশ হয়। 'পবিত্র কোরআন ও ইসলামের নির্দেশ' পালনের শপথ গ্রহণ করে উপস্থিত যুবকরা। তাদের পরনে খাঁকি পোশাক আর মাথায় শোলার টুপি। এই অবস্থায় তারা কলকাতার নানা এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায়। ১৬ আগস্ট সকাল সাড়ে আটটায় মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের জমায়েত হয়।

▯ তখন ছিল রমজান মাস। মুসলিম লীগ নেতারা ঘোষণা করার সময় মনে করিয়ে দেন : 'It was in Ramzan that permission for jehad was granted by Allah.' লীগ নেতারা মসজিদে উপস্থিত হয়ে এ বিষয়ে আরও উত্তেজনা ছড়িয়েছিলেন। মহম্মদ উসমান প্রচার করেছিলেন অত্যন্ত উত্তেজক উর্দু প্রচারপত্র। তরোয়াল হাতে জিন্নাহর ছবি ছাপিয়ে সেই প্রচারপত্রে ছাপা হয় 'আশা ছেড়ো না। তরোয়াল তুলে নাও। ওহে কাফের, তোমার ধ্বংসের দিন বেশি দূরে নয়।'

▯ কলকাতার বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থায় মুসলিম ন্যাশনাল কোর গড়ে তোলে। তারা সর্বত্র হুঙ্কার ছড়াতে থাকে। ১৫ আগস্ট রেল কর্মীদের একটি বড় সভায় মুসলিম লীগ নেতা নুরুল হুদা ঘোষণা

করেন, 'আর আওয়াজ তোলার দরকার নেই, এখন চাই কাজ'— 'No more slogans. The clarion call has come for action and nothing but action.'

এর পাশাপাশি হিন্দুরা কলকাতায় সংখ্যাগুরু হওয়া সত্ত্বেও ছিলেন যথেষ্ট অপ্রস্তুত। এর দু'তিনটি কারণ আছে। প্রথম, বাংলার হিন্দু জনসত্তা ছিল আত্মখণ্ডিত। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো হিন্দু মহাসভার নেতাদের প্রভাব ছিল— তবে সবাই তাঁদের সমর্থন করতেন না। বাংলার কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী-ফরওয়ার্ড ব্লক ও সাম্যবাদীদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। হিন্দু মহাসভার মতো তারা কেউ প্রকাশ্যে হিন্দু-স্বার্থ রক্ষার কথা বলতেন না। পরিস্থিতি এতদিন পরেও খুব বদলেছে বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয়, সাম্যবাদীরা মুসলমানদের প্রকাশ্যে সমর্থন করতেন। ১০-১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ কলকাতায় বি. পি. এস. এফ-এর ডাকে বিশাল ছাত্র মিছিল হয়। কমিউনিস্টরা এতে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সম্পর্কে, সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতির ব্যাপারে ঘোষণা করে। এর একটি দিন তারা 'রসিদ আলি দিবস' নামে অভিহিত করেছিল। এই ছাত্র মিছিল নিয়ে বামপন্থী সাহিত্যে যা লেখা হয় তা অতিরঞ্জন ছাড়া কিছু নয়। প্রাপ্ত চিত্রে মিছিলটি মোটেই বড় বলে মনে হয় না। তাছাড়া ওই ছাত্ররা সমাজের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কিনা সন্দেহ। ২৯ জুলাই এ. আই. টি. ইউ. সি.-র ডাকে একটি শিল্প ধর্মঘট হয়। ১৬ লক্ষ শ্রমিক এতে অংশগ্রহণ করেন। কমিউনিস্টরা অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিল। তাদের নেতারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে এদের অধিকাংশই হচ্ছেন মুসলমান। আর তাই তাদের ধারণা ছিল কলকাতার শ্রমিকরা মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আন্দোলনে অংশ নেবেন না। বাইরে একথা বললেও ১৪ আগস্ট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে একটি বড় সভা হয়। সেখানে ১৬ আগস্টের ধর্মঘট সমর্থন করা হয়। একথা তাই জলের মতো পরিষ্কার যে কমিউনিস্ট পার্টি মুসলিম লীগের হিংসাশ্রয়ী দাঙ্গামুখী প্রত্যক্ষ

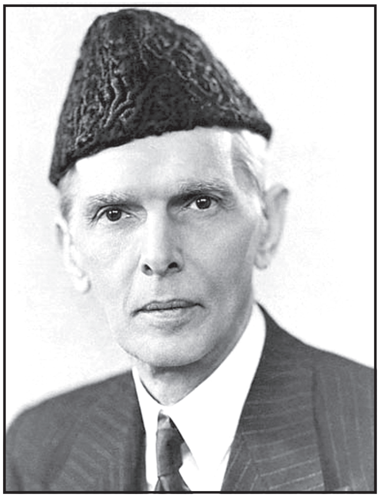

মুহম্মদ আলি জিন্নাহ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ব্যাপারে কোন স্তরে হুঙ্কার দিয়েছিলেন তা বোঝা যাবে তাঁর এই উক্তিতে— 'Today we have also forged a pistol and we are in a position to use it.' কলকাতাই যে তাদের লক্ষ্য তা বুঝতে পারি। কারণ ওইদিন কলকাতায় ভয়ঙ্কর হাঙ্গামা 'serious trouble' ঘটাতে তিনি কর্মীদের উৎসাহিত করেন।

সংগ্রামকে সমর্থন করেছিল। দীর্ঘদিন ধরে তারা বাংলার মধ্যবিত্ত হিন্দু সাধারণকে একইভাবে মূর্খ বানিয়ে আসছেন। তাদের ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে মুসলমানদের সমর্থন ছাড়া অন্য কিছু নয়।

তৃতীয়, বাংলার হিন্দু সমাজ মুসলমানদের মতো সংগঠিত ছিল না। কলকাতা শহরে হিন্দুমহাসভা ও বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামান্য কিছু ব্যায়ামাগার ছিল। সেসব সমিতিতে যুবকরা দেহচর্চা করতেন, লাঠি খেলতেন— তবে তাদের মধ্যে সম্মিলিত কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না।

মিজানুর রহমান ওইদিন সকালে খবরের কাগজ কিনতে যাচ্ছেন শুনে তাকে দুধের 'ডাব্বা' দেওয়া হয়। নিয়ে আসার জন্য। বাজার শুনশান। কিছু পাননি মিজানুর। হঠাৎ শুনতে পান মানিকতলা ব্রিজের উপর এক গোয়ালার উপর মুসলমানরা চড়াও হয়েছে। গোয়ালা তাদের কাছে অনুনয় বিনয় করেন— চালানের দুধ মারা যাবে তার। মুসলমানরা তার কথা শোনেনি। সরকারি ছুটি তার উপর সেদিন ডাকা হয়েছে হরতাল। সুতরাং 'গোয়ালা গোবেড়েন মার খায় এবং তার দুধের ভাণ্ড ফেলে দেওয়া হয়— দুধ গড়িয়ে রাজপথ একাকার।' এখানেই শুরু। অন্তত উত্তর ও মধ্য কলকাতায়। খবরটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দুরা সমবেতভাবে সম্ভবমতো প্রতিরোধ করতে চায়। অপ্রস্তুত প্রতিরোধ।

মিজাপুর রহমান লিখেছেন— ঐদিন 'বড় ভাইয়েতে আমাতে মিলে গড়ের মাঠে যাবো আগে থেকেই সব ঠিকঠাক। সকালেই মিছিল যাওয়ার কথা। কলকাতার তাবৎ মুসলিম পল্লী থেকে একে একে মিছিল যাবে ওই গড়ের মাঠে।' তাই তাকে সকাল সাতটা নাগাদ খবরের কাগজ কিনে আনতে যেতে হয়। তবে মিজানুর এখানে সামান্য ভুল করেছেন। 'সকালেই মিছিল যাবার কথা' ছিল যুবক-মুসলমান দের। তার লক্ষ্য ছিল মুসলিম ইনসটিটিউট। সকাল সাড়ে আটটায় শুরু হয় সেই জমায়েত। এনিয়ে আগে উল্লেখ করেছি। ধারণা হয় মিজানুর ও তাঁর দাদা এই জমায়েত থেকেই যান ময়দানের সভায়।

সকাল থেকেই মুসলমানরা লুটপাট আরম্ভ করে। মানিকতলায় সাত সকালে 'দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' লুট হয়ে যায়। বিকেলে নানা স্থান থেকে মুসলমানরা মিছিল

করে ময়দানের দিকে যেতে থাকে। 'লক্ষ্মীকান্তপুর, রাণাঘাট, নৈহাটি, ব্যারাকপুর' অঞ্চল থেকেও দলে দলে মিছিল আসতে থাকে। বৌবাজারের মুখে ছিল 'ফ্রেসকো' নামে বিখ্যাত চায়ের দোকান— পুড়ে যায় সেই দোকান। পশ্চিমা মুসলমানরা মাঝে মাঝে মিছিলকারীদের উত্তেজিত করতে থাকে— 'কাঁচি উর্দুতে' তারা বোঝায় শহরের নানা জায়গায় হিন্দুরা মুসলমানদের কচুকাটা করছে। এর ফলে মিছিল মারমুখী হয়। বৌবাজার বরাবর অলঙ্কারের দোকানগুলি লুট হয়ে যায়। মিছিলের নেতৃত্ব আওয়াজ তোলে 'লোটো ভাইয়া যেত্না হিন্দু দুকান'। বিখ্যাত 'কমলালয় ডিপার্টমেন্ট স্টোর্স', কে সি বিশ্বাসের বন্দুকের দোকান, সি সি সাহার গ্রামোফোনের দোকান সম্পূর্ণ লুটে নেয় লুঠেরার দল। জবাকুসুম কেশ তৈলের দোকান লুঠ হয়, নিহত হন তার মালিক। পুলিশ কোথাও কোনো কর্তব্য পালন করেনি। মিজানুরের ভাষা 'একটা লালপাগড়ির' দেখা পাননি তারা।

পুলিশ শুধু নিষ্ক্রিয় ছিল তাই নয়। গোয়েন্দা পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার পঞ্চানন ঘোষাল জানিয়েছেন, মুসলিম লীগ সরকার তখন বিচিত্র কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 'সিভিকগার্ড'-এর পদ বাতিল হয়। সব থানার ইনচার্জ করা হয় মুসলমান অফিসারদের। লালবাজারে তখন চালু হয় বিশেষ কন্ট্রোল রুম— সেখান থেকে সমস্ত থানাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল, নিষ্ক্রিয় রাখা হয়েছিল পুলিশবাহিনীকে। এই অপরাধের কোনো বিচার হয়নি। বাঙালি ইতিহাস-বিস্মৃতজাতি— এই অভিযোগ তুলেছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। ইতিহাস বিস্মৃতির সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়াহীন ধর্মনিরপেক্ষতার আধুনিকতাকে ভীরুতা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না।

১৬ আগস্টের লুঠতরাজের আরও কিছু দৃষ্টান্ত পেলাম। যথা—

- ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র আবদুল মোহাইমেন দেখেছেন পার্ক সার্কাস অঞ্চলে হিন্দুবাড়ি ভাঙচুর হচ্ছে— লুট হচ্ছে হিন্দুর দোকান। চিনি, মসলা, মাখন, জেলি লুট হচ্ছে। মোহাইমেন নিজেও লুটেছিলেন 'সের দশেক চাল'। পরদিন সকালে পাড়া ঘুরে দেখেছেন তিনি হিন্দুদের দোকান সবই লুট হয়ে গেছে! অধিকাংশ হিন্দুবাড়ির দরজাই ভাঙা।

- পার্কসার্কাসের কড়েয়া অঞ্চলের বাসিন্দা বলাই দত্ত-রা থাকতেন থানার সামনেই। চারপাশে লুট তরাজের মধ্যে কড়েয়া থানার সাহায্য চাইতে গিয়ে তারা শুনেছেন সাহায্য পাওয়া যাবে না। 'সুরাবর্দি সাহেবের হুকুম নেই।' ১৬ আগস্ট সকাল থেকেই শুরু হয় হিন্দু দোকানগুলিতে লুটপাট।

- ১৭ আগস্ট মল্লিক বাজার এলাকার হিন্দু বাড়িগুলিতে ঢুকে মুসলমান গুণ্ডারা আক্রমণ করে। শান্তি মল্লিক থাকতেন আত্মীয়ের বাড়িতে। আক্রমণ হলো। ছুরি হাতে এল লুঠেরারা। গয়নাগানটি সব লুটে নিয়ে চলে যায় তারা। সব বাড়িতেই চলে লুটপাট। এক ভদ্রলোক গুণ্ডাদের রুখতে বন্দুক হাতে দাঁড়ান— তার হাতে ছুরি চালায় গুণ্ডার দল।

- সুপরিকল্পিত দাঙ্গা, দাঙ্গা না বলে হত্যাকাণ্ড বলাই ঠিক। একটি চিত্র বার বার ফিরে এসেছে প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিকথায়। গোয়ালাদের উপর আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য। মিজানুর রহমানের কথা লিখেছি। শান্তি মল্লিকরা মল্লিক বাজার থেকে ভবানীপুর যাবার পথে দেখেছেন 'ঠেলাগাড়ি করে মড়া নিয়ে যাচ্ছে— গোয়ালাদের মৃতদেহ।' আবদুল মোহাইমেনের মনে পড়েছে '১৬ তারিখ সকালেই হাওড়া, বেলেঘাটা, চিৎপুর, গড়িয়াহাটা অঞ্চলে বেশ কয়েকজন মুসলমান গোয়ালা এবং সবজিওয়ালা আক্রান্ত হন।' হাস্যকর স্মৃতি। গোয়ালারা মুসলমান হন না। ধারণা হয় হরতালের সকালে গোটা কলকাতার দুধ নিয়ে যে গোয়ালারা বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আসা করবেন তাদের উপর হামলা করা হবে। এর মাধ্যমে কলকাতার হিন্দুদের লাঠি ধরতে পারা সাহসী মানুষদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চেয়েছিল লীগ নেতৃত্ব।

ছেচল্লিশের দাঙ্গার নায়ক সুরাবর্দি।

১৬ আগস্ট ময়দানের সভাটি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ভিড়ের মধ্য থেকে একটি রক্তে ভেজা লুঙ্গি বা পাঞ্জাবি দেখানো হয়— হিন্দুরা কেমন করে আক্রমণ করছে তার প্রমাণ। সভা চঞ্চল হয়ে পড়ে। সভার সভাপতি প্রধানমন্ত্রী সোহরাবর্দি বহুকষ্টে সভাকে শান্ত করেন। বক্তৃতা অবশ্য বেশিক্ষণ চলেনি। প্রতিহিংসাপরায়ণ রক্তলোলুপ জনতা দাঙ্গা লুঠ করতে করতে ফিরে চলে যায়। মিজানুরের ভাষা— 'ঘরে ফেরা কিছু লুটেরা যথাবিধি বেছে বেছে হিন্দুদের দোকান লুটের উল্লাসে মাতে। নরকে যমরাজেরও অনুচর থাকে, কিন্তু সেদিন কলকাতার পথে ঘাটে একটি পুলিশেরও দেখা মেলেনি।... যে যা পাচ্ছে হাতিয়ে নিচ্ছে হিন্দুদের দোকান থেকে।'

ফেরার পথে মিজানুর, তার দাদা আর বৈঠকখানা বাজারের কাকা— তিনজন যান হাসপাতালে। মিজানুরের পিতা সেখানে অস্ত্রোপচারের অপেক্ষায় ভর্তি। তার খবর নিতে গিয়ে আর এক অভিজ্ঞতার মুখে পড়লেন। পরপর তিন দিন হাসপাতাল থেকে বের হতে পারলেন না। নেহাৎই ঘটনাচক্র। আর তার ফলে আমাদের জন্য রক্ষা পেল ছেচল্লিশের দানবীয় হত্যাকাণ্ডের এই আশ্চর্য দলিল। লেখক মিজানুর রহমানকে ধন্যবাদ। তিনি সম্ভবমত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সম্প্রতি কথাটি লিখেছেন। সামান্য কিছু ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার ব্যাপারে তাঁর অভিমত বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। তবু এই স্মৃতিচিত্রে দাঙ্গার সূচনা ও পরিণতির একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে উঠেছে।

কলেজ স্ট্রিটের অদূরে তদানীন্তন 'প্রিন্স অব অয়েলস হাসপাতাল' আজকের কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এলেন মিজানুররা। পিতাকে দেখে তারা শুনলেন, সকালের নমাজের সময় কাছের মসজিদে 'নমাজ পড়তে আসা মুসলমানদের কচুকাটা করা হয়েছে। ('কৃষ্ণ ষোলোই'; ৪৮ পৃ.)। আমাদের মনে হয় মিজানুর এখানে তারিখটি ভুল করেছেন। ১৬ নয়, এ ঘটনা ১৭ বা ১৮ আগস্টের। প্রথম দিনের দাঙ্গা (দাঙ্গা না বলে হত্যাকাণ্ডই বলা যায়) ছিল এক তরফা। পরে হিন্দু ও শিখরা প্রতিরোধ করেছিল। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে তেমনি মনে হয়। হাসপাতাল চত্বরেই তাদের থাকতে হয় তিনদিন। তার ফলে তারিখের গোলযোগ হওয়া অসম্ভব নয়।

হাসপাতালের বেয়ারা ফিরোজ— যাকে মিজানুরের বাবা চাকরি দিয়েছিলেন, তার ডেরায় রাত কাটাতে হয় তাদের। বিকেলের দিকে একটা লরি ঢোকে। 'লরির লোকেরা চারপাশের আবরণগুলো নাবিয়ে দিলে! কী ভীষণ! কী ভয়ানক! কী বীভৎস!' মিজানুরের ভাষা— 'এলোমেলোভাবে একে অপরের গায়ে ওপরে নিচে ক্ষত বিক্ষত রক্তে রাঙা নাওয়া লাশ আর লাশ আর লাশ! ...কারও পা নেই, কারো হাত নেই, কারো পেট কাটা, কারো গলা, আর আমার চোখের সামনে যে দেহটি— তার নাড়িভুড়ি সব

'কৃষ্ণ ষোলই'-এর লেখক মিজানুর রহমান।

বেরিয়ে ঝুলছে একপাশে আর পুরো মুখটাই থেঁতলানো একটা গর্ত— তখনও ওই গর্ত বেয়ে টস টস করে গলে পড়ছে রক্ত আর নাভিগুলো থিরথির করে কাঁপছে আর থেকে থেকে খিচুনি! তার মানে পুরোপুরি নিস্পন্দ হয়নি, 'প্রাণ' তখনও আছে!' জরুরি বিভাগে কেউ তাকে নিয়ে যায়নি। যাবার মতো অবস্থাও ছিল না।

১৭ তারিখ আরও ভয়াবহ হয় পরিস্থিতি। মিজানুরের বর্ণনা— 'গতকাল যা দেখিছি তার চেয়ে সংখ্যার দিক থেকে এবং বীভৎসতার বিচারে সব মাত্রাই যে ছাড়িয়ে গেছে আজ। বিরামহীন গাড়ির মিছিল, নিথর লাশ আর আহত মানুষের আর্ত চিৎকারে ও গোঙানিতে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।' এই অদ্ভুত কদর্য প্রাণঘাতী দাঙ্গা পরিস্থিতির তুলনা সভ্যজগৎ কোনোদিন প্রত্যক্ষ করেনি। জার্মানদের ইহুদি হত্যা, স্টালিনের সময়কার সাইবেরিয়ার কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বা কাম্বোডিয়ার পলপটের গণহত্যার কথা শোনা যায়— সেসবও Great Calcutta Killing-এর সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে হয় না।

মেডিকেল কলেজের পিছনে সেন্ট্রাল এভিনিউ আর ফিয়ার্স লেনের মুখে মিজানুর ১৮ আগস্টের দুপুরে যা দেখেছেন তা এক কথায় অবর্ণনীয়। 'ফিয়ার্স লেনের মোড়েই বলা যায়। কিন্তু ওকি! ঠেলাগাড়ি উপচে পড়ছে মানুষের লাশে। ২০/২৫ জনের লাশ তো বটেই। অবস্থাপন্ন বলেই মনে হলো— অন্তত জামা কাপড় তাই বলে। পরে জেনেছি ফিয়ার্স লেনের মুসলমান গুণ্ডাদের কাজ ওটা। প্রায় একশ গজ দূরে লাশ বোঝাই আরেকটা ঠেলাগাড়ি চোখে পড়লো!' এই দ্বিতীয় ঠেলা গাড়ির মৃতদেহগুলির মাঝখান থেকে একজন সহসা হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে। উদ্যত মৃত্যুর মাঝখানে একজনের আকুল জীবনাকাঙ্ক্ষা। থেমে থেমে ইডেন চক্ষু হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু 'আরো কয়েক হাত এগিয়ে হঠাৎ সটান শুয়ে পড়ল লোকটা— আর নড়া চড়া নয়। বুঝলাম বাঁচা ওর হলো না।'

সাবেক নামে হাসপাতালের এক কর্মীর অভিজ্ঞতা মর্মস্পর্শী। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছেন তাকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হত বা আহতদের স্ট্রেচারে করে আউটডোরে আনতে হবে। হিন্দু বাড়ি সব। 'রক্তে রক্তে বাড়িগুলো ভেসে যাচ্ছে। ছেলে বুড়ো মেয়ে মানুষ কাউকে রেহাই দেয়নি পিশাচগুলো।' একটি ঘরে সাবেক দেখেছে এক মায়ের কোলে তার শিশু— দুজনেই মৃত। 'মায়ের বুকে ঘুমিয়ে আছে চিরতরে প্রিয় সন্তান।'

পরেরদিন মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গাণে মৃতদেহের পিরামিড জমে উঠল। পাওয়া যেতে থাকল দুর্গন্ধ। হঠাৎ একটা রিক্সায় 'নাড়িভুড়ি বের হওয়া দুটি লাশ' চাপিয়ে আসছিলেন এক ওড়িয়া বৃদ্ধ। মৃত যারা তারা তার আত্মীয়। ফিয়ার্স লেনে থাকতেন তারা চল্লিশ পঞ্চাশজন। সকলেরই পেশা ছিল কাপড় কাচা, ইস্ত্রি করা। দু তিনজন মুসলমান গুণ্ডা এসে তাদের সকলকেই কুপিয়ে শেষ করেছে। পায়খানায় ঢুকে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন ওই বৃদ্ধ। পরদিন পুলিশ এলে কোনোরকমে উদ্ধার পেয়ে দুই ভায়ের দেহ খুঁজে এনেছেন। আশা, হয়ত মর্গ থেকে মুক্ত করে সৎকারের ব্যবস্থা করবেন। বাকি মৃতদেহ চিরকালের জন্য শুয়ে আছে বাসাবাড়িতে।

দাঙ্গার সময় স্থির বুদ্ধিতে যাঁরা সামান্য হলেও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন তাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলেন। লেডি ব্রার্বোন কলেজে দাঙ্গা

দুর্গতদের একটা সাময়িক শিবির গড়া হয়। হিন্দু শরণার্থীরা প্রতিবেশী মুসলমানদের সাহায্যের কথা উচ্চকণ্ঠে বলেছেন। মুসলমান শরণার্থীরাও প্রতিবেশী হিন্দুদের ঈশ্বরের দূত বলে ভেবেছেন। ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপনা করতেন ভবতোষ দত্তমশাই। তিনি লিখেছেন : 'ইসলামিয়ার ছাত্ররা যে আমাদের জন্য কতটা করতে পারত তার প্রমাণ পেলাম ১৯৪৬-এর রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়। বালিগঞ্জ থেকে ইসলামিয়া কলেজের রাস্তায় পদে পদে বিপদ। এই রাস্তা আমাদের ছাত্ররা পার করে দিত। ওল্ড বালিগঞ্জের কাছে অপেক্ষা করত আর সেখান থেকে ওয়েলেসলি স্ট্রিটে কলেজে নিয়ে যেত। আবার সেভাবেই ফিরিয়ে দিয়ে যেত। ('আটদশক' : ভবতোষ দত্ত; প্রতিক্ষণ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯১; ১১৭ পৃ.)।

অন্য এক রকম অভিজ্ঞতার কথা পেলাম কবি সম্পাদক সুশীল রায়-এর স্মৃতিচিত্রে। 'আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ঘটে গেছে ভীষণ কাণ্ডটি কলকাতার ময়দানে। সেখানে যারা জমায়েত হয়েছিল তারা চারদিকে ছিটকে পড়ে। প্রাণরক্ষার জন্যে যে যেদিকে পেরেছে ছুটে গিয়েছে। কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ শেয়ালদা পর্যন্ত এসে দক্ষিণে যাবার জন্যে ট্রেনে চেপেছে। সবার ওপরেই অল্পবিস্তর হামলা হয়েছে। একটি লোক আমাদের পল্লীতে এসে ঢুকে পড়েছে। অনেকে তাকে অনেক জেরা করছে। বেগতিক অবস্থা বুঝতে পেরে আমরা দুজন এগিয়ে যাই।' ('স্বগত' : সুশীল রায়; এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড; ১৯৮৩; ১৩৬-১৩৭ পৃ.)। তাঁরা দু'জন— সুশীল রায় আর সুবোধ ঘোষ। দিনটি সম্ভবত ১৭ বা ১৮ আগস্ট। কারণ একটু পরেই একজন সেপাই রাইফেল হাতে টহল দিচ্ছিল— তার তাড়ায় সুশীলবাবুরা পিছিয়ে পড়েন। কারণ সোহরাবর্দি সেই দাঙ্গার সময় লালবাজারে বসে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বারণ করেছিলেন। ১৭ আগস্ট রাত্রের আগে সারা কলকাতা কার্যত ছিল অরক্ষিত।

রমজান মাস চলছিল। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এসময় সকাল থেকে সন্ধ্যে পানাহার থেকে বিরত থাকেন। রোজার মাসে কোরানপাঠ করেন অনেকে। রমজান মাসে যুদ্ধ করা নিষেধ ছিল। 'কৃষ্ণ ষোলোই' পড়লে মনে হয় ধর্মীয় অনুশাসন মুসলমানদের কাছে যতটা রাজনৈতিক ছিল ততটা মোটেই পালনীয় বোধ করেনি তারা। ১৬ আগস্ট ময়দানের জমায়েতে সোহরাবর্দি স্পষ্ট জানিয়ে ছিলেন মুসলমানরা যথেচ্ছ দাঙ্গা করতে পারে— সেদিন পুলিশ কোথাও বের হবে না। লালবাজারে বসে সোহরাবর্দি সেদিন সমস্ত থানাকে নিষ্ক্রিয় রাখার ব্যাপারটি নিশ্চিত করেন। কোনো রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আসনে অধিষ্ঠিত কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত এরকম করতে পারেন! অবিশ্বাস্য বোধ হয়। কিছু সংবাদ জানানো দরকার :

- সরকার দাঙ্গাকারীদের লরি, পেট্রল, কেরোসিন যোগান দিয়েছিল।
- মিছিলে যাবার জন্য ব্যবহার করা হয় করপোরেশনের গাড়ি। বলে রাখি কলকাতায় তখন মুসলিম লীগের মেয়র মহম্মদ উসমান।
- সোহরাবর্দি নিজে উপস্থিত থেকে বস্তিতে বস্তিতে মুসলমান গুণ্ডাদের তৈরি রাখেন। কামারশালা থেকে বানানো হয় ছোরা-বল্লম অস্ত্রশস্ত্র। সেসব মসজিদে জমা করা হতে থাকে।
- মুসলমান ছাত্রদের হস্টেলে কেরোসিন, স্পিরিট, অস্ত্র যোগাড় করে রাখা হয়।
- কয়েকদিন আগে থেকেই হিন্দু দোকানগুলির সামনে বিশেষ চিহ্ন দেওয়া হয়— এসবকে লুটে নেবার উদ্দেশ্যে।

হিন্দুরা সেই তুলনায় তেমন প্রস্তুত ছিল কিনা সন্দেহ। তারা বাড়ির ছাতে যোগাড় রেখেছিল কিছু ইট পাটকেল আর গরম জল। সেসব ছুঁড়ে দেওয়া হয় মুসলমান দাঙ্গাকারীদের উপর। সংখ্যায় বেশি হলেও হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ ছিল না। উপরন্তু তফসিলভুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নেতৃত্বে একদল নিম্নবর্গের হিন্দু নিজেদের লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন— নিরপেক্ষ থাকার কথা ঘোষণা করেন। ১৫ আগস্ট ১৯৪৬ তাদের ডাকা জমায়েতে ময়দানে উপস্থিত ছিলেন কিছু নেতা। তখন যোগেনবাবু লীগ-মন্ত্রিসভার মাননীয় মন্ত্রী। সাকুল্যে ৫/৭ শো লোক মিছিল করে সেদিন নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থানের কথা ঘোষণা করেন। সেখানে বক্তৃতা দেন অমূল্যধন রায়, কামিনী প্রসন্ন মজুমদার, শশিভূষণ হালদার, অপূর্বলাল মজুমদার প্রমুখ। বৃটিশ সরকার আর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' করার কথা ঘোষণা করেছিলেন তারা! পরে যোগেনবাবু বিবৃতি দিয়েছিলেন মুসলিম লীগের কর্মসূচি এমন বেপরোয়া দাঙ্গা হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে তা তিনি বুঝতে পারেননি।

কিছুদিন পর যোগেনবাবুর আত্মোপলব্ধি আরও চমৎকার; তফসিল ফেডারেশনের মুখপত্র 'জাগরণে' তিনি প্রচার করেছিলেন— 'the Scheduled Caste people to keep themselves aloof from the bloody fued between the Congress and the Muslim League even at the risk of mylife ?' তখন হিন্দু সমাজ ক্ষুব্ধ হয়ে যোগেনবাবুকে আক্রমণ করলে তিনি রক্ষা পান একজন বর্ণহিন্দু প্রতিবেশীর দ্বারা। 'I cannot but gratefully acknowledge the fact that I was saved from the wrath of infuriated Hindu mobs by my Caste Hindu neighbours.' তখন যোগেনবাবুর আরও উন্নতি হয়েছে। স্বাধীন পাকিস্তানে তিনি হয়েছেন আইনমন্ত্রী। আর তবু বুঝেছেন মুসলমানদের কাছে তিনি ও তাঁর সমাজের মানুষরা অত্যাচার অপমান ছাড়া কিছুই পাননি। শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করে চলে আসেন ভারতে। যে ভারত তাঁর মতে হিন্দুদের রাষ্ট্র আর তা নাকি তফসিলি জনসাধারণের আত্মবিকাশের সুযোগ রাখেনি।

এই ভুল ও বিপজ্জনক প্রবণতা কলকাতা দাঙ্গার আর একটি অন্ধকার দিক। মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ বোঝার জন্য যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। পূর্ববঙ্গের দাঙ্গা পরিস্থিতির কথা অন্য কোনো সময় অন্য কোনো অবসরে বলব। ▌

নিঃশব্দে চলে গেল শতবর্ষের 'রডা'

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১৪ সালের ২৬ আগস্ট একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যার গুরুত্ব অপরিসীম। ঘটনাটি এই কলকাতার বুকেই ঘটেছিল। এক রোমহর্ষক অস্ত্রলুণ্ঠন অভিযান যার বিষয়ে কলকাতার খুব অল্পসংখ্যক লোকই জানে। ওই বৈপ্লবিক ঘটনার সঙ্গে বিপ্লবী শ্রীশ মিত্র এবং হরিদাস দত্তের নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

১৯০১ সালের ১৯ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ যখন ঢাকায় যান, তখন হরিদাস দত্ত ঢাকাতেই ছিলেন, তাঁর মামার বাড়িতে। তাঁর দাদা যোগেশ দত্ত ছিলেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সহপাঠী।

কলকাতায় গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউয়ে রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের চার নায়ক অনুকূলচন্দ্র মুখার্জি, গিরীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী এবং হরিদাস দত্ত-র মূর্তি।

দাদার মাধ্যমেই হরিদাস দত্ত হেমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হন। হেমচন্দ্র যখন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করতে যান, দশ-এগারো বছরের বালক হরিদাস তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। স্বামীজীকে প্রণাম করবার পর পেয়েছিলেন তাঁর আশীর্বাদ। মাথায় তাঁর করস্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন, তাঁর শরীরে ও মনে এক নতুন শক্তির সঞ্চার হয়েছিল।

স্বামীজী বলেছিলেন— "পরাধীন জাতির ধর্ম নেই। তোদের একমাত্র কাজ হবে যথার্থ মানুষের শক্তি অর্জন করে পরস্বাপহারীকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া।"

বালক হরিদাস দত্তকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ যাঁকে তিনি জীবনের আদর্শ বলে মেনেছিলেন সারাজীবন।

এবার আসছি রডা অস্ত্র-লুণ্ঠনের প্রসঙ্গে। আত্মোন্নতি সমিতি নামে যে বৈপ্লবিক সংস্থাটি স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিল, তারই একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন শ্রীশ মিত্র। তিনি কাজ করতেন আর. বি. রডা কোম্পানির অফিসে। তিনি ওই কোম্পানিতে করণিকের পদে ছিলেন। পদ হিসেবে সামান্য কিন্তু তিনি যে খবরটি ভেতর থেকে এনেছিলেন, বিপ্লবীদের কাছে তা ছিল অসামান্য। সেই খবরটি ছিল এই যে, অস্ত্র ব্যবসায়ী আর. বি. রডা কোম্পানির জন্য এক বিশাল অস্ত্রসম্ভার দু-তিন দিনের মধ্যেই কাস্টমস্ হাউসে এসে পৌঁছবে। এরই সঙ্গে আসছে তিব্বতের দালাই লামার জন্য পঞ্চাশটি মসার (mauser) পিস্তল এবং পঞ্চাশ হাজার রাউন্ড কার্তুজ।

এই খবরটি বিপ্লবী মহলে আলোড়ন জাগাল। মুক্তি সঙ্ঘ ও আত্মোন্নতি সমিতির সদস্যরা ওই অস্ত্র লুণ্ঠন করার পরিকল্পনা করলেন। কাজটা ছিল সাঙ্ঘাতিক ঝুঁকিপূর্ণ। দিন দুপুরে ডালহৌসি স্কোয়ারের মতো জনবহুল রাস্তায় অস্ত্রবাহী গাড়িতে হামলা চালানো রীতিমতো কষ্টসাধ্য। কোনো কোনো সদস্য পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা অসম্ভব। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যিনি পরবর্তীকালে মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম. এন. রায় নাম নিয়েছিলেন, তিনি আলোচনাসভা ছেড়ে উঠে বেরিয়ে যান। কারণ তাঁর মতে পরিকল্পনাটি ছিল উদ্ভট এবং কষ্টকল্পিত। আরও কয়েকজন তাঁর পেছন পেছন বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মুক্তি সঙ্ঘ ও আত্মোন্নতি সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ বিষয়টাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলেন। মুক্তি সঙ্ঘের হরিদাস দত্ত, শ্রীশ পাল ও খগেন দাশ হাত মেলালেন আত্মোন্নতি সমিতির অনুকূল মুখার্জী, শ্রীশ মিত্রদের সঙ্গে। তাঁদের পেছন থেকে নেতৃত্ব দিলেন হেমচন্দ্র ঘোষ ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী।

অস্ত্রলুণ্ঠনের আগের দিন অর্থাৎ ২৫ আগস্ট ১৯১৪ তারিখে ঠিক হলো যে অনুকূল মুখার্জী একটা গোরুর গাড়ি যোগাড় করবেন আর সেই গোরুর গাড়িটির গাড়োয়ান হবেন হরিদাস দত্ত। প্ল্যান করা হলো যে কাস্টমস্ হাউস থেকে মালগুলি রডার অফিসে আনবার সময় রডা কোম্পানির কর্মচারী শ্রীশ মিত্র মসার পিস্তল ও কার্তুজের বাক্সগুলো হরিদাস দত্তের গোরুর গাড়িতে তুলে দেবেন। শ্রীশ মিত্রের দায়িত্বই ছিল কাস্টমস্ হাউস থেকে আসা অস্ত্রশস্ত্র কোম্পানির গাড়িতে উঠিয়ে দেওয়া। সুতরাং তাঁকে কেউ সন্দেহ করবে না। হরিদাস দত্ত ছদ্মবেশ ধারণ করবেন, তাঁর নাম হবে কুঞ্জ গাড়োয়ান। তাঁর চালানো গোরুর গাড়িটি চলতে শুরু করবে মাল নিয়ে এবং অন্য গাড়িগুলির মতো রডার গুদামে না গিয়ে চলে যাবে মলঙ্গালেনে, অনুকূল মুখার্জীর বাড়িতে। সেখান থেকে পিস্তল ও কার্তুজ বিভিন্ন বিপ্লবী সংগঠনের মধ্যে ভাগ

করে দেওয়া হবে। দায়িত্ব থাকবে অনুকূল মুখার্জীর। যেমন কথা তেমনই কাজ। শ্রীশ পাল হরিদাস দত্তকে নিয়ে গেলেন বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর অনুগামী প্রভু দয়াল হিম্মত-সিংকার কাছে। তাঁকে বলা হলো যে পরদিন সকালে হরিদাসবাবুকে একটি বিহারী গাড়োয়ানের রূপসজ্জা দিতে হবে, কেউ যেন আসল লোকটিকে চিনতে না পারে। তাই হলো। নিখুঁত মেকআপ এবং পোশাক; কদম ছাঁট চুল, গায়ে কালো ফতুয়া, গলায় কালো কারে বাঁধা পিতলের ধুকধুকি, পরনে হেঁটো ধুতি, তাও আধ ময়লা।

কুঞ্জ গাড়োয়ানের গোরুর গাড়ি যথাসময়ে রডার মাল বহনকারী অন্য গোরুর গাড়িগুলির ঠিক পেছনে এসে দাঁড়ালো শ্রীশ মিত্র শেষ গাড়িটায় মসার পিস্তল ও কার্তুজের বাক্স তুলে দিলেন, মোট গাড়ি ছিল সাতটি। বর্তমানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে স্ট্র্যান্ড রোড পর্যন্ত ছিল কাস্টমস্ হাউসের ব্যাপ্তি। গোরুর গাড়িগুলি সারিবদ্ধ ভাবে চলতে শুরু করল, সবার পেছনে কুঞ্জ গাড়োয়ানের গাড়ি, যার দু'-পাশে নিরাপত্তা রক্ষী হিসেবে পায়ে হেঁটে চলেছেন শ্রীশ পাল এবং খগেন দাশ।

এখন যেখানে টেলিফোন ভবন, তার বিপরীতে ভ্যানসিটার্ট রো-তে সামনের গোরুর গাড়িগুলি রডার অফিস অভিমুখে চলে গিয়েছিল। সবার পিছনে কুঞ্জ গাড়োয়ানের গাড়িটি ডানদিকে না গিয়ে বেশ দুলকি চালে চলে এল মলঙ্গা লেনে অনুকূলবাবুর ডেরায়।

বিপ্লবীরা যা চেয়েছিলেন, তাই হয়েছিল। এরপর অনুকূল মুখার্জী সুপরিকল্পিত ভাবে অস্ত্রগুলি বিভিন্ন বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির ডেরায় ডেরায় পাঠিয়ে দেন। যার ফলশ্রুতি হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেই বাংলার বিপ্লবীদের মনোবল অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় তাঁর 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থে লিখেছেন— ''রডার অস্ত্রে সজ্জিত হয়েই বাংলার বিপ্লবীরা বহুক্ষেত্রে তাঁদের বিপ্লবী সংগ্রামকে প্রচণ্ডতর করতে পেরেছেন এবং অবসাদগ্রস্ত জাতিকে ঊষার পদধ্বনি শুনিয়েছেন। বস্তুত বালেশ্বরে বুড়িবালামের তীরে বিপ্লবী মহানায়ক বাঘা যতীন ও তাঁর সতীর্থবৃন্দ ওই অস্ত্র নিয়েই সেই ঐতিহাসিক যুদ্ধ (নয়ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৫) করেছিলেন।''

ওই ঘটনার কয়েকদিন বাদে মাল চেকিং-এর সময় রডা কোম্পানি হিসেবে গরমিল পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেয়। অবশ্য ততদিনে রডার কর্মচারী শ্রীশ মিত্র (ডাক নাম হাবু) যে ছিল নাটের গুরু, গা ঢাকা দিয়েছেন। শ্রীশ পাল তাঁকে রংপুর জেলায় নাগেশ্বরী থানা এলাকায় ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ বর্ধনের আশ্রয়ে রেখে আসেন। ডাক্তার বর্ধন মুক্তি সঙ্ঘের আঞ্চলিক অধিনায়ক ছিলেন। তাঁর আশ্রয়ও খুব নিরাপদ মনে না হওয়ায় শ্রীশ মিত্র অসম সীমান্তে 'রাভা' নামক অধিবাসীদের কাছে চলে যান। রাভারা ডাক্তার বর্ধনের একান্ত অনুগত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে মোষ চরাবার কাজ মিত্র চালিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু ডাক্তারবাবু গ্রেপ্তার হবার পর তাঁর কী হলো জানা যায় না। সীমান্ত অতিক্রম করতে গিয়ে রক্ষীবাহিনীর গুলিতে না হিংস্র কোনো পশুর হাতে তাঁর নিধন হয়েছিল, আজও জানা যায়নি। নিঃসন্দেহে আমাদের দুর্ভাগ্য যে তাঁর শেষ পর্যন্ত কি হলো, আমরা কেউ জানতে পারলাম না। তবে যেভাবেই তাঁর মৃত্যু হোক, সেই মৃত্যু ছিল শহীদের মৃত্যু, একথা অনস্বীকার্য। হরিদাস দত্ত পুলিশের জালে ধরা পড়েন এবং তাঁর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। প্রেসিডেন্সী জেলের চুয়াল্লিশ সেলস্ ইয়ার্ডে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদি হিসেবে জনমানবহীন কারাগারে তাঁকে বন্দী জীবন কাটাতে হয়। মুক্তি পাবার পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাঁকে কুখ্যাত রেগুলেশন থ্রিতে বন্দী করে হাজারিবাগ জেলে পাঠানো হয়। শ্রীশ পাল ১৯১৬ সালে ধরা পড়েন। তিনিও রেগুলেশন থ্রিতে অর্থাৎ বিনা বিচারে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে জেলে ঢোকেন। রডা ষড়যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলো যে একমাত্র শ্রীশ মিত্র ছাড়া ওই ঘটনার সঙ্গে জড়াবার মতো তথ্যপ্রমাণ এমনকী কোনো খবরও পুলিশের কাছে ছিল না, তাই পুলিশ কেবলমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে কয়েকজনকে (হরিদাস দত্ত সহ) জেলে পোরে। সুতরাং পুলিশ রিপোর্ট বা কোর্ট প্রসিডিংস থেকে ওই লুণ্ঠনকাণ্ডের ইতিহাস কিছুই জানার উপায় নেই। বিপ্লবীদের কর্মদক্ষতা এবং মন্ত্রগুপ্তি শিক্ষার অনবদ্য নজির রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের ঘটনা থেকে জানা যায়।

রডা অ্যাকশন প্রসঙ্গে বিপ্লবী কালিদাস বসুর কথাও উল্লেখযোগ্য। ওই অ্যাকশন হবার পর শ্রীশ মিত্রের অন্তর্ধানের খবর তাঁর কর্মস্থলে চাউর হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে পুলিশ লুণ্ঠিত মালের খোঁজে বিপ্লবীদের আস্তানাগুলিতে হানা দেবে, তা জানাই ছিল। সে কারণেই বিপ্লবী কর্মীদের ঝড়ের বেগে সব কাজ সারতে হয়েছে। আগেই ঠিক করে ফেলতে হয়েছিল মাল প্রথমে কোথায় ডাম্প করা হবে, কীভাবে কোথায়

> **“পরাধীন ভারতে রডা অস্ত্রলুণ্ঠনের মতো একটি অসম সাহসিক, রোমহর্ষক বৈপ্লবিক ঘটনা সবার অলক্ষ্যে, নীরবে, নিঃশব্দেই শতবর্ষ পার করল অতি সম্প্রতি। স্বর্গের চেয়েও প্রিয় ছিল জন্মভূমি যাঁদের কাছে, জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য যাঁরা নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে দেশমাতৃকার চরণে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, সেই শ্রীশ মিত্র, হরিদাস দত্তদের স্মৃতিতে একটি মোমবাতিও জ্বলল না।”**

সঙ্গে সঙ্গে সরাবার ব্যবস্থা করা হবে, কারা মাল সরাবার দায়িত্বে থাকবে, রডার ছাপ মারা বাক্সগুলো ওই দিনই কোথাও ফেলে দিয়ে নিজেদের কেনা ছোট ছোট বাক্সে মালগুলো কোথায় বসে কারা কারা ভরবে, এসবই আগে থেকে ঠিক করা ছিল। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, প্রতিটি বাক্সে R.B. Rodda & Co. স্ট্যাম্প মারা ছিল। রডা অ্যাকশনের অভিনবত্ব ছিল 'Speed'। অনুকূল মুখার্জী প্রথমেই মালগুলি স্থানান্তরিত করেন বিপ্লবী ভুজঙ্গ ধরের বাড়িতে। ওই বাড়ি তখনো পুলিশের গোচরে আসেনি। কালিদাস বসুর নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ি ছিল। তিনি তাঁর ঘোড়ার গাড়িতে মালগুলি ঠিক জায়গায় পাচার করে দেন। ছোট বাক্স থেকে দুটি পিস্তল ও কিছু বুলেট নিয়ে শ্রীশ পাল শ্রীশ মিত্রকে নিয়ে ওই দিনই দার্জিলিং মেল ধরে রংপুর কুড়িগ্রামের ডেরায় চলে গিয়েছিলেন। হাবু মিত্র পাহাড়ি রাভাদের সহযোগিতায় সম্ভবত সীমান্ত পেরিয়ে চীনের দিকে যাবার চেষ্টা করেছিলেন। রাভাদের কাছ থেকে এই শেষ খবর পাওয়া যায়, তারপর থেকে এই মহান দেশপ্রেমী সম্পূর্ণ নিখোঁজ হয়ে যান।

আত্মোন্নতি সমিতির সতীশ দে'র একটি চিঠি সাপ্তাহিক বসুমতীর ১.৭.৬৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তিনি রডা অ্যাকশনে তাঁর পরোক্ষ অথচ সক্রিয় ভূমিকার কথা লিখেছেন। ১৯১৪ সালের এক বিকেলে কলেজ থেকে বইখাতা হাতে তিনি যখন বাড়ি ফিরছিলেন তখন ডিক্সন লেনে বিপিনদার (বি. বি. গাঙ্গুলী) সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর আদেশে সতীশ দে তখনি তাঁর দুই বিপ্লবী বন্ধু বসন্ত ও জগৎকে নিয়ে জেলেপাড়া লেন ও হিদারাম ব্যানার্জী লেনের মোড়ে চলে গেলেন, গাড়িতে আসছে মসার পিস্তল ও কার্তুজ। ওই ভারী মালগুলি মালবাহী কুলির মতো পিঠে, কাঁধে বয়ে নিয়ে ভুজঙ্গদার বাড়িতে গিয়ে রাত্রির মধ্যে বাক্সগুলি খুলে পিস্তল ও কার্তুজ বের করে অন্য কয়েকটি বাক্সে ভরতে হবে। জামা ছেড়ে খালি গায়ে, খালি পায়ে, কোমরে কাপড় জড়িয়ে তাঁরা যথাস্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। মাল বয়ে নিয়ে সরু গলির মধ্যে ভুজঙ্গবাবুর বাড়িতে সিঁড়ির নীচে একটা ছোট ঘরে বাক্সগুলি খুলে পাওয়া গেল পঞ্চাশটি মসার পিস্তল আর কার্তুজ ছিল পঞ্চাশ হাজার রাউন্ড অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ। মসার পিস্তলগুলি লণ্ঠনের আলোয় যখন ঝকঝক করতে লাগল, তাঁদের কী আনন্দ! বন্ধু বসন্ত পিস্তলগুলির নাম দিয়েছিল 'খোকা'। এক একটা স্ট্রীপে দশটা কার্তুজ লাগানো, এই দশটা নিয়ে এক রাউন্ড। পিস্তলগুলো ছিল স্বয়ংক্রিয়, গুলি ভরতে স্ট্রীপটা রেখে চাপ দিলেই দশটা কার্তুজ ফায়ারিং এর জন্য রেডি হয়ে যায়। একটা ফায়ার করলেই খোলটা আপনা থেকেই পড়ে যায় এবং পরেরটা সেই জায়গায় এগিয়ে আসে। খুব তাড়াতাড়ি এই ভাবে লোড করা ও ফায়ার করা সম্ভব। কাঁধের খোলটা পেছনে লাগিয়ে পিস্তলগুলি কাঁধে রেখে রাইফেল হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। প্রায় দেড় মাইল রেঞ্জে কাজ চলে। দূর পাল্লার জন্য রেঞ্জ ঠিক করার ব্যবস্থা আছে। বড় বাক্স খোলা, ছোট বাক্সে ভরা, প্যাকিং-এর কাঠ, অয়েল পেপার ইত্যাদি পোড়ানো, জল ঢেলে পরিষ্কার করা, যাতে পুলিশ সার্চ করতে এলে কিছু না পায়, এইসব কাজ তাঁরা করলেন সুষ্ঠুভাবে সারারাত ধরে। শেষ রাত্রে যে যার বাড়ি ফিরে গেলেন। তাঁরা কিন্তু ওইদিন বিকেলের আগে ওই ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। কৌতূহল ছিল বিপ্লবীদের কাছে নিষিদ্ধ। বৈপ্লবিক মন্ত্রে তাঁরা দীক্ষা নিতেন গীতা হাতে নিয়ে। যখন যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে, অবিচল চিত্তে সে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে।

রডা অস্ত্র লুণ্ঠনের ইতিহাস অনেকের কাছেই অজনা। নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার অবদান সম্বন্ধে বলতে গেলে কিছুই জানে না। ওরা জানে ভারতের স্বাধীনতা এসেছে গান্ধীজী ও নেহরুর জন্য। বাংলার বিপ্লবীরা যে ইংরেজ শাসকবর্গের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল, তা ওদের অজানা। ওদের দোষ দিতে পারি না, স্কুল কলেজের কোনো পাঠ্যবইতে বাংলার বিপ্লবীদের বিষয়ে কিছু থাকে না। ভারতে স্বাধীনতার পর থেকে সব থেকে বেশি সময়ব্যাপী শাসনক্ষমতা ছিল অহিংসার পূজারি কংগ্রেসীদের হাতে। তাই স্বাধীনতার যুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামীরা তাঁদের কাছে ছিলেন ব্রাত্য। তবে আজ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মনে হয় সকলেই স্বীকার করবেন যে ভগৎ সিং-রাজগুরু-সুখদেবদের ফাঁসী, নেতাজী সুভাষের রহস্যজনক অন্তর্ধান, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের রহস্যজনক মৃত্যু, ড. মেঘনাদ সাহার করুণ পরিণতি অহিংসার পূজারিদের আসল চরিত্রটি উন্মোচিত করে দিয়েছে নিঃসন্দেহে।

এদেশের বিপ্লবীদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দেশমাতাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। জীবন-মৃত্যু ছিল তাঁদের পায়ের ভৃত্য। তাঁরা জানতেন ধরা পড়লে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতে হবে, অত্যাচার সহ্য করতে হবে মন্ত্রগুপ্তির শপথ রক্ষার্থে, মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে, তা সত্ত্বেও তাঁরা জীবন ও জীবিকাকে বাজি রেখে স্বাধীনতার যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেছেন। আজ সময় এসেছে এঁদের কথা তরুণ প্রজন্মকে জানাবার, যাতে তারা হলিউড, বলিউড, ফেসবুক, হোয়াটস্অ্যাপ ভুলে গিয়ে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হতে পারে, স্বাধীনতার মূল্য বুঝতে পারে, দেশকে ভালবেসে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে। তবেই হবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাদের শ্রেষ্ঠ শহীদ তর্পণ।

এদেশে প্রায় প্রত্যেক বছর কিছু না কিছুর, কারও না কারও শতবার্ষিকী পালিত হয়। সিনেমার, খেলার, উপন্যাসের, গানের, এমনকী রাজনৈতিক নেতার সোয়া শতবার্ষিকীও সাড়ম্বরে পালিত হতে দেখি। অথচ পরাধীন ভারতে রডা অস্ত্রলুণ্ঠনের মতো একটি অসম সাহসিক, রোমহর্ষক বৈপ্লবিক ঘটনা সবার অলক্ষ্যে, নীরবে, নিঃশব্দেই শতবর্ষ পার করল অতি সম্প্রতি। স্বর্গের চেয়েও প্রিয় ছিল জন্মভূমি যাঁদের কাছে, জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য যাঁরা নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে দেশমাতৃকার চরণে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, সেই শ্রীশ মিত্র, হরিদাস দত্তদের স্মৃতিতে একটি মোমবাতিও জ্বলল না। ২০১৪ সালের ২৬ আগস্ট কখন চলে গেল, কেউ জানল না।

(লেখিকা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা)

চিঠিপত্র

‘শান্তির ললিতবাণী ব্যর্থ পরিহাস’

১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধের সময় কাকসর লাংপার-এর নিকটে ক্যাপ্টেন সৌরভ কালিয়া-সহ ৫ ভারতীয় সৈন্য পাকসেনার হাতে বন্দী হন, ২২ দিন তাঁদের বন্দী শিবিরে আটক রেখে বর্বর পাকসেনারা অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে ক্ষত বিক্ষত দেহ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ফেরত দেয়। অত্যাচারগুলির নমুনা ইতিপূর্বে বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। লোহার রড গরম করে এদের কানের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হোত, চোখ উপড়ে নেওয়া হোত, যৌনাঙ্গ কেটে নেওয়া— অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করলে মুখে ঢেলে দেওয়া হতো ফুটন্ত জল, সারা শরীরে সিগারেটের ছেঁকা, জিভ কেটে নেওয়া, দাঁত ভেঙ্গে দেওয়া ইত্যাদি ছিল অত্যাচারের অঙ্গ বিশেষ। এই বর্বোরচিত অত্যাচার জেনেভা কনভেনশনের পরিপন্থী। পাকিস্তান একটি বর্বর দেশ, তাদের নীতি হলো, বিধর্মী সেনা ধরা পড়লে অকথ্য অত্যাচার করে তাদের মনে ত্রাস সঞ্চার করা। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে কুখ্যাত পাক সেনানায়ক Brig S.K. Malick-এর লেখা The Quaranic concept of war বইটা পড়ে দেখতে পারেন। এই বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন আর এক কুখ্যাত পাক সেনানায়ক Genl. Zia-ul-Hoque (Printed in bahar 1979)। পাকিস্তানের এই বর্বোরচিত ঘটনার পর প্রাক্তন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেঃ শঙ্কর রায়চৌধুরী -সহ অনেক সেনা আধিকারিক সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। কিন্তু কোনো সরকারই এই বর্বোরচিত ঘটনার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়নি। বরং পাকিস্তানের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভুলে গেছেন যে এই বর্বর দেশটির জন্মই হয়েছিল কট্টর হিন্দু বিদ্বেষের মধ্য দিয়ে। দেশ ভাগের কিছুদিন পরেই ভারত সরকারের বিশিষ্ট আমলা বি. কে. নেহরু দেশভাগজনিত আর্থিক লেনদেনের সুষ্ঠু সমাধানের জন্য পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। ওই সময় মুসলিম লীগের মুখপত্র করাচির ‘ডন’ পত্রিকা অনবরত ভারত-বিরোধী প্রচার চালাতো। ফলে দুই দেশের মধ্যে ঘৃণা, অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ ভাব সঞ্চারিত হতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বি. কে. নেহরু পাকিস্তানের প্রথম সেক্রেটারি চৌধুরী মহম্মদ আঙ্গিকে বলেন ‘তোমাদের দাবিমতো পাকিস্তান তো পেয়েই গেছে, এখন আবার এসব প্রচার কেন?’ মহম্মদ আলির চাঁছাছোলা জবাব, ‘পাকিস্তানকে নতুন নেশানের রূপ দিতে একটি স্থায়ী শত্রু পক্ষের প্রয়োজন।’ ধর্মীয় ভিত্তি ছাড়া পাকিস্তানের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রাখা যাবে না, সুতরাং এটা তারই প্রতিক্রিয়া সন্দেহ নেই, এ ব্যাপারে বহিঃশত্রু হিসাবে ভারত এবং হিন্দুরাই একেবারে ‘রেডিমেড শত্রু’। বি. কে. নেহরু আবার প্রশ্ন করলেন, ‘পাকিস্তান কী এটা ভেবে দেখেছে, যদি ভারতের হিন্দুরাও এই তত্ত্বে সোচ্চার হয়ে বলে হিন্দুরা বিপন্ন, তখন কী হবে? মহম্মদ আলি মৃদু হেসে বললেন, আমরা তাতে বিন্দুমাত্র ভীত নই, কারণ তোমাদের ধর্ম অন্ধ গোড়ামিকে প্রশ্রয় দিতে একবারেই অপারগ। বাজপেয়ীজী বাস নিয়ে সদভাবনা যাত্রায় পাকিস্তান গিয়ে পেলেন কার্গিল। একদিন সন্ধ্যায় তিনি লাহোর দুর্গ দেখতে গিয়েছিলেন, সেখানে জেহাদি মুসলমানরা তাঁর গাড়ির উপর পাথরবৃষ্টি করেছিল এবং কালো পতাকা দেখিয়েছিল। সেইসব ঘটনাকে গুরুত্ব দিতে বারণ করেছিলেন তিনি— শান্তির ললিতবাণী যাতে ব্যর্থ পরিহাস না হয়ে দাঁড়ায়।

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

মেকলের ভূত

আজ দেশে দূরদর্শনের মাধ্যমে অনেকগুলি সম্প্রচার সংস্থা কাজ করে চলেছে, যা বিগত এনডিএ সরকারের মাধ্যমে প্রসারভারতীর অবদান। আগেকার দিনে বিভিন্ন নাট্যসংস্থা ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক কাহিনি অবলম্বনে লোকশিক্ষার কাজ করে গিয়েছে। কিন্তু আজকের দূরদর্শনে যে ধারাবাহিকগুলি সম্প্রচারিত হয় তার মধ্যে থাকে হিংসা, ষড়যন্ত্র, পারিবারিক কলহের ছড়াছড়ি। যে কাহিনিগুলিকে অবলম্বন করে ধারাবাহিকগুলি তৈরি হয় তার মধ্যে দেখানো হয় হিন্দু সাধুসন্ন্যাসীরা যেন সবাই ভণ্ড, খৃষ্টান পাদ্রীরা যেন দয়ার অবতার, মুসলমান কোনো এক চরিত্র যেন চরম হিতৈষী ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি ইত্যাদি। এসব অনুষ্ঠান যারা হাঁ করে দেখেন এবং বিনোদন বলে ভাবেন, তাঁরা কখনও চিন্তা করেন না যে এগুলির দ্বারা পরিকল্পিত ভাবে তাঁদের ধর্মসংস্কৃতিকেই অপমান করা হচ্ছে। মিরাক্কেল নামের অনুষ্ঠানে হিন্দুদেবদেবীদের নিয়ে যেরকম ব্যঙ্গ করা হয়েছে তাঁর শতাংশের একাংশও যদি ইসলামধর্ম নিয়ে করা হোত তাহলে কীরকম তুলকালাম হোত তা সকলেই জানেন।

এছাড়া ধারাবাহিকগুলি এবং প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে ভাষা ব্যবহার ঠিকমতো হওয়া উচিত। নামে বাংলা হলেও একটি বাংলা প্রচারসংস্থা যেভাবে বাংলাভাষার প্রতি অবিচার করে তা দর্শকরা কী ভাবেন? এখানে ‘পারফরম্যান্স’ ‘জাজ’ ‘ব্রেক’, ‘ওয়ান্ডারফুল’ এই শব্দগুলির বদলে ‘পরিবেশনা’, ‘বিচারক’ ‘বিরতি’ ‘চমৎকার’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা যায় না? স্বামীদের পরিচয় দিতে গিয়ে ‘হাসব্যান্ড’, ‘মা’কে ‘মম্’, বড় ভাইকে ‘ব্রো’, ‘কিন্তু’ কে ‘বাট’, ‘এবং’-কে ‘অ্যান্ড’, ‘ঠিক আছে’-কে ‘ও.কে’ ইত্যাদি শব্দগুলির অনাবশ্যক ব্যবহার যে কোনো স্বাভিমানসম্পন্ন দর্শকের কানে বিষ ঢেলে দেয়। এসব দেখে শুনে মনে হয় মেকলে সাহেব কবরের ভেতর শুয়ে শুয়ে হাসছেন আর বলছেন ‘ভারতের কেমন অবস্থা করে এসেছি দ্যাখ্! ইংরেজ কবে চলে গেছে কিন্তু আমার ভূত ওই জাতটার কাঁধ থেকে নামেনি এখনও।’

—**প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়,**
বৈষ্ণবঘাটা, পাটুলি, কলকাতা।

রাজধর্ম পালনে শক্তি প্রয়োগের অপরিহার্যতা

নির্মলেন্দু চক্রবর্তী

ভারতীয় সভ্যতার ধারা যদি ভালভাবে অনুধাবন করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে পরস্পর বিপরীত দুটি ধারা সমান্তরাল ভাবে ভারতীয় শাস্ত্র বিধানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। একটি হিংসা, অপরটি তার একেবারে বিপরীত অহিংসা। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে— বেদ, বেদান্ত, মহাভারত, রামায়ণ, স্মৃতি ও শ্রুতি সাহিত্যে একদিকে যেমন অহিংসার জয়গান করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি গীতা, মহাভারত, রামায়ণ, চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে হিংসার অপরিহার্যতার কথাও বলা হয়েছে। হিংসা ও অহিংসা দুটিই মানুষের একটা মানসিক অবস্থা— প্রথমটি জৈব ধর্মের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। মনুষ্য সমাজ তথা জীব জগতের সর্বত্রই হিংসার এই সার্বিক প্রকাশ দেখা যায়। পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকল চলমান জীবের মধ্যে হিংসার উপস্থিতি ও প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অহিংসা মনের স্বাভাবিক গতি নয়। এটা আয়াস লভ্য, শ্রম সাপেক্ষ। জীব জগতে একমাত্র মানুষই নিরন্তর নৈষ্ঠিক অনুশীলন দ্বারা অহিংসা আয়ত্ত করতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে অহিংসার প্রথম অনুশীলন নিদান দেখা যায় ঋষি পতঞ্জলির যোগদর্শনে। বিক্ষিপ্ত মনকে যে পদ্ধতির দ্বারা আত্মস্থ বা নিয়ন্ত্রিত করা যায় তার নামই যোগ। অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম ধাপের নাম যম। আবার এই যমের মধ্যে যে পাঁচটি ধাপ আছে তার প্রথমটি অহিংসা। 'কায়-মন-বাক্যের দ্বারা কাহারও ক্লেশ উৎপাদন না করার নাম অহিংসা।' হিন্দু ধর্মমতে অহিংসার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। তবে আমার মনে হয় আত্মার কাঙ্ক্ষিত নির্বাণ লাভের পথে অহিংসার অনুশীলন যত প্রয়োজন, দেহের বিনাশ রক্ষায় তেমন হিংসা প্রয়োগেরও প্রয়োজন রয়েছে। আত্মা ও দেহ এই দুইয়ে মিলেই তো মানুষ। দেহ আত্মার আধার। দেহ না থাকলে আত্মার মোক্ষ সাধনার প্রশ্ন নেই। গৌতম বুদ্ধ, বর্ধমান মহাবীর, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ ভিন্ন ভিন্ন যুগে অহিংসার প্রচারক— কেউই রাজা ছিলেন না। তাই রাজধর্ম পালনের কোনো দায় তাঁদের ছিল না। প্রথম দু'জন ধর্ম প্রচারক— মুক্তি মার্গের পথিক, তৃতীয় জন প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেও ক্ষমতার রাজভবনে প্রবেশ করেননি। সম্রাট অশোক রাজা থেকে অহিংসা ধর্ম প্রচারের উদ্‌গাতা হয়েছিলেন। ফল কিন্তু সবদিকে শুভ হয়নি। অনেক ঐতিহাসিকের মতে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা ভারতের সামরিক শক্তির অনুশীলন স্তব্ধ হয়ে যায়। মৌর্য সাম্রাজ্য টেকেনি। ধ্বংস হয়েছে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার ক্ষমতা ও মানসিকতা। দেশ বোধহয় আজও সেই রোগ থেকে মুক্তি পায়নি। শত্রুর বিরুদ্ধে উপযুক্ত শক্তি প্রয়োগে আজও অনীহা ও কুণ্ঠা সর্বজনবিদিত।

অপরদিকে দেহধারী মানুষদের তো দেশ আছে। সমাজ আছে, রাষ্ট্র আছে। রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা আছে। সেখানেও কী অহিংসা তত্ত্ব সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজে বাস্তব অবস্থার মুখে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে ধর্ম রক্ষায় হিংসার কথা বলেছেন। অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ। আর শক্তি প্রয়োগ কখনও অহিংস হতে পারে না। ধর্ম রক্ষায়, রাজ্য রক্ষায়, প্রজা পালনে রাজার জন্য শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র প্রবলভাবে সত্যনিষ্ঠ হয়েও সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কাধিপতি রাবণের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগে বাধ্য হয়েছিলেন। আর এই শক্তি প্রয়োগকালে অনেক নীতিবিরুদ্ধ কাজও করতে হয়।

যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর প্রতি ভারতীয় আচরণের দুর্বলতা প্রথম ধরা পড়ে ভারতে বিদেশি আক্রমণের সময়। বিশেষ করে মুসলমান আক্রমণের কালে। মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধে ও কূটনীতিতে শত্রুর প্রতি মানবিক আচরণের কোনো নিয়ম নেই। ক্ষাত্র-নীতি ভারতীয় রাজাদের কাছে ছিল অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু সেই নীতির দয়া-দাক্ষিণ্য মুসলমান শাসকদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। মহম্মদ ঘোরি ১১৯১ সালে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর রাজা পৃথ্বীরাজের কাছে পরাজিত হয়ে একখানা পা ভেঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। পৃথ্বীরাজ তার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে ধরার চেষ্টা করেননি। পরের বৎসর মহম্মদ ঘোরি আরো বেশি সৈন্য নিয়ে পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করে একই জায়গায়। এবার পৃথ্বীরাজ পরাজিত হয়ে পালানোর চেষ্টা করলে মহম্মদ ঘোরি তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁকে ধরে নিহত করে।

"তৈমুর লং কয়েকবার ভারত অভিযান করে ভারতের পশ্চিমাংশের কোনো কোনো জায়গা দখল করেছিল। তার পৌত্র মিরচা তার সব জায়গা দখলে রাখতে পারে নাই। কঙ্কর নামে এক হিন্দু রাজা ওই অঞ্চল স্বাধীন হলে মিরচা তার বিরুদ্ধে সাতবার আক্রমণ করেও জয়ী হতে পারে নাই। শেষবার পরাজিত হয়ে কঙ্করের হাতে তিনি বন্দী হয়। হিন্দু রাজা শরণাগত শত্রুকে মুক্তি দান করলেন এই শর্তে যে সে আর তার রাজ্য আক্রমণ করবে না ও রাজস্বের দাবি উত্থাপন করবে না। মিরচা নিষ্কৃতি পেয়ে পুনরায় তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে। এবার ফল বিপরীত হলো। কঙ্কর পরাজিত হয়ে বন্দী হলেন। মিরচা বন্দীর দুটি চোখ নষ্ট করে তাঁকে শৃঙ্খলিত করে রাখে (মোগল ইতিহাস। এফ. এফ. কারটন প্রণীত, প্রথম সংস্করণ, লন্ডন, ১৭০৯, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ২৯-৩১ পৃ.)। এ রকম বহু দৃষ্টান্ত মুসলমান রাজত্বকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে আছে।

ভারত আজ বিশ্বে একটি প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। তবু প্রতিবেশী দুই একটি রাষ্ট্র অবিরাম নানাভাবে তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ভারত তার প্রতিকার বা প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারছে না। দুর্বল রাষ্ট্রনীতি শত্রু বা প্রতিপক্ষকে আক্রমণে উৎসাহিত করে যা একদিন দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন করতে পারে। ভারত এখন প্রতিবেশীদের নিকট একটি Soft State বা দুর্বল রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে।

(লেখক রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত)

পরম্পরা

অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা
শ্রীঅরবিন্দ

শ্রী বি সি নাগ

শ্রীঅরবিন্দের জন্ম ১৫ আগস্ট ১৮৭২। সাতচল্লিশে এই ১৫ আগস্টই ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভারত তাঁর স্বপ্নের ভারত নয়। কেন এরকম ঘটল তা কারোর অজানা নয়। পণ্ডিচেরির সাধু অবশ্য এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঘটনাটিকে তার প্রথম পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন এবং ঋষির অভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে ঘোষণা করেছেন : ‘‘বাস্তবিকই আজ আমি দেখতে পাচ্ছি যে, যেসব জাগতিক আন্দোলন আমার জীবদ্দশাতেই সফল হবে বলে আমি আশা করেছিলাম সেগুলি ধীরে ধীরে সফল হচ্ছে বা হতে চলেছে। অথচ সেগুলি এক অবাস্তব স্বপ্নের মতো ছিল। এই সব আন্দোলনের মধ্যে স্বাধীন ভারতকেও তার ভূমিকা সফল করতে হবে এবং নেতৃত্ব-পদ নিতে হবে।

কিন্তু মুসলমানের পুরাতন সাম্প্রদায়িক বিভেদ এখন দেশের স্থায়ী রাজনৈতিক বিভাগের রূপ নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। আশা করা যায় এই নির্ধারিত সত্যকে চিরদিনের জন্য নির্ধারিত বলে গ্রহণ না করে সাময়িক একটা ব্যবস্থা মাত্র বলে গ্রহণ করা হবে। কেননা এই বিভাগ স্থায়ী হলে ভারত ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়বে ও পঙ্গু হয়ে যাবে; এর ফলে অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ, নতুন কোনো বিদেশি আক্রমণ এবং আবার পরাধীনতার আশঙ্কা পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। সেই অবস্থায় ভারতের অভ্যন্তরীণ উন্নতি ও সমৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় তার মানের অবনতি ঘটবে। ভারতের ভাগ্য তখন বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠবে, হয়তো বা ঘটবে ভাগ্যবিপর্যয়।

এ হতে দিলে চলবে না। দেশ বিভাগ রদ করতেই হবে। আশা করি স্বাভাবিক ভাবেই তা ঘটুক। শান্তি, সংহতি ও যৌথ কর্মের প্রয়োজনীয়তার ক্রমোপলব্ধি, যৌথ কর্মের অভ্যাস এবং দেশ বিভাগ রদ করার উপায় আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই এই লক্ষ্যপ্রাপ্তি সম্ভব হবে। এইভাবে একতা আসবে— তা সে যে কোনো রূপেই আসুক না কেন। সেই একতার রূপের কোনো মৌলিক গুরুত্ব থাকবে না, থাকবে ব্যবহারিক গুরুত্ব। কিন্তু যেভাবেই হোক না কেন দেশ বিভাগ রদ করতেই হবে, রদ হবেই। কেননা ভারতের ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য তা একান্ত আবশ্যক।’’

ভারতের আধ্যাত্মিকতা

তাঁর আর একটি স্বপ্ন— জগতের কাছে ভারতের আধ্যাত্মিক দান— ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ভারতের আধ্যাত্মিকতা উত্তরোত্তর ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রবেশ করছে :

‘‘এই আন্দোলন আরও বাড়বে। বর্তমানে যে ধ্বংসলীলা চতুর্দিকে চলেছে তাতে অনেক দেশই আশাভরা দৃষ্টি নিয়ে ভারতের দিকে তাকাচ্ছে। তারা যে উত্তরোত্তর কেবলমাত্র তার শিক্ষাকেই গ্রহণ করছে না নয়, তার যৌগিক এবং আধ্যাত্মিক সাধনাকেও তারা গ্রহণ করছে।’’

তাঁর সর্বশেষ স্বপ্ন ছিল সেই ক্রমবিবর্তনের পথে পদক্ষেপ করা যা মানুষকে উচ্চতর এবং বৃহত্তর জ্ঞানের পথে উন্নীত করবে। তিনি যখন থেকে মানুষের পূর্ণ প্রাপ্তি এবং আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিলেন তখন থেকেই যে সব সমস্যা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল সেই সব সমস্যার সমাধানও তখন শুরু হবে।

‘‘এই ক্রমবিবর্তন যদি ঘটাতে হয় তবে তা আত্মার উন্নতি এবং আত্মসচেতনতার উপলব্ধির মাধ্যমেই করতে হবে।’’ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবিও বলেছেন যে,

একবিংশ শতাব্দীতে ভারত পৃথিবীর আধ্যাত্মিক গুরুর স্থান গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ

শ্রীঅরবিন্দের প্রথম স্বপ্ন অখণ্ড ভারত। স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে এই স্বপ্ন সার্থক হওয়ার পথে দ্বিতীয় পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি। শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মুজিবুর রহমানের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এত বেশি যে তিনি সব সময়েই রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি প্রথম যে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন সেখানেও শেষকালে তিনি রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। ঢাকায় বাংলাদেশের জনতার সামনে তাঁর প্রথম বক্তৃতায় তিনি তিনবার রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতি দেন। রবীন্দ্রনাথেরই একটি কবিতাকে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মতো তিনিও কবিগুরুর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। এটি কোনো আকস্মিক যোগাযোগের ঘটনা নয়। ঋষি অরবিন্দের ভক্তের কাছে এ একটা ঈশ্বরনির্দিষ্ট ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়।

শেষ পদক্ষেপ

পাকিস্তানের বর্তমান অবশিষ্ট অংশে অবিভাজ্য ভারতের কল্পনার উদ্বোধনই হবে ঋষি অরবিন্দের অখণ্ড ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবার তৃতীয় এবং শেষ পদক্ষেপ। তা দেশ বা উপমহাদেশ যা কিছু নামই একে দেওয়া যাক না কেন। বর্তমানে আমি দুটি বা তিনটি পৃথক রাজনৈতিক বিভাগের কথা ভাবছি না। কেননা এ জাতীয় বিভাগ বহুবার দেখা গিয়েছিল। এই বিভাগ থাকে থাকুক। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সকলের মৌলিক যোগসূত্র থাকায় সকলের এক আদর্শ, এক কল্পনা এবং এক আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। কেননা শ্রীঅরবিন্দ নিজেই বলেছেন যে, ''এগুলির কোনো মৌলিক গুরুত্ব নেই।'' রবীন্দ্রনাথও কী 'ভারত-তীর্থ' কবিতায় বলেননি—

''এসো হে আর্য, এসো অনার্য হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত হোক অপনীত সব অপমান ভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে।
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।''

এই জাতীয় ঐক্যের চিহ্ন যে পাকিস্তানেও দেখা দিচ্ছে তা সন্ধানী চোখে ধরা পড়ে। পাকিস্তানের জনক জিন্না, কবি ইকবাল, স্যার জাফরুল্লা খান এবং মাউন্টব্যাটেন প্রমুখ যাঁরা ভারত-বিভাগ করেছিলেন তাঁরা প্রথম থেকেই এই 'ভৌগোলিক উদ্ভট অবাস্তবতা'কে বিশ্বাস করতে পারেননি। ভাবাবেগ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একতার আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে অবচেতন মনে দানা বাঁধতে থাকে। পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যেই এই ঘটনা ঘটে।

পাকিস্তানের পুরাতনের প্রতি টান

পাকিস্তানের সোয়াত অঞ্চলে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা কার্য চালাবার পরে আর্কিও লজিক্যাল সার্ভে অব্ পাকিস্তান একটি বিবরণী প্রকাশ করে। তার মুখবন্ধে আয়ুব খান একে পাকিস্তানের ঐতিহ্যের চিহ্ন বলে দাবি করেন। '৬১-'৬২-তে আমি যখন আমেরিকায় ছিলাম তখন রাষ্ট্রসঙ্ঘে আমাদের প্রতিনিধি কথা প্রসঙ্গে মোহেন-জো-দাড়োর সভ্যতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। পাকিস্তানি প্রতিনিধি এতে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠে বলেন যে, এটা ভারতের ব্যাপার নয়। এটা পাকিস্তানের ঐতিহ্যের অন্তর্গত। জনৈক পাকিস্তানি সাংবাদিক আমাকে একটি পুস্তিকা দিয়েছিলেন 'পাকিস্তানের পাঁচ হাজার বছর'। পুস্তিকাটি দেখে বেশ মজা পেয়েছিলাম।

আয়ুবের ছেলে গহর আয়ুবের যে বিরাট শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে তার নাম 'গান্ধার ইন্ডাস্ট্রিজ'। এই 'গান্ধার' নামটি দেখে কি মনে হয় না যে পাকিস্তান গৌরবময় মহাভারতের যুগের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী। খান আবদুল গফ্ফর খান দাবি করেন যে সংস্কৃত বৈয়াকরণ পাণিনি ছিলেন পাখতুন। কেননা তাঁর জন্ম পেশোয়ারে (প্রাচীন পুরুষপুর)। কয়েক বছর আগে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাণিনির তিন সহস্রতম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। শিক্ষিত পাখতুন ও আফগানরা স্বীকার করেন যে সংস্কৃত হলো পুস্তু ভাষার জননী। পাক সরকারের মন্ত্রী হিসাবে শ্রীভুট্টো একবার কলকাতায় এসেছিলেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান কলকাতায় আসতে পেরে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করছেন। রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাড়িটি তিনি দেখতে গিয়েছিলেন। তখন তিনি বলেছেন যে তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের একজন অনুরাগী। হয়তো রবীন্দ্রনাথ কালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যোগসূত্র হবেন।

'কনফেডারেশন' প্রসঙ্গে

ইতিমধ্যে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই নানা মহলে কথা উঠছে যে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে একটি কনফেডারেশন করা হোক। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ভুট্টো বলেছেন যে এটা অসম্ভব। তবুও এই বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে পাক বুদ্ধিজীবী মহলে একটা চিন্তা শুরু হয়েছে। এই বীজ অঙ্কুরিত হতে হতে কিছুটা সময় লাগবে। তবে আজকের এই জেট যুগে তার জন্য খুব বেশি সময় লাগবে বলে মনে হয় না। অখণ্ড ভারত আবার হবে। হবে কেবলমাত্র এই কারণে নয় যে এই দেশের ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি তা চাইছে। অখণ্ড ভারত হবে এই কারণে যে ঈশ্বরের দ্বারা তা নির্দিষ্ট। কোনোরকম ধর্মীয় গোঁড়ামি কিংবা বড় বড় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এর পুনরাবির্ভাবকে ঠেকাতে পারবে না।

ভুট্টোর নিজের জন্মস্থান সিন্ধুর এক শ্রেণীর মুসলমান আজ আওয়াজ তুলেছেন, 'জিয়া সিন্ধু'। তারা রাজা দাহিরকে দেশপ্রেমিক বলে ঘোষণা করেছেন। আর দাহিরের সঙ্গে যার লড়াই হয়েছিল সেই আরব সেনাপতি মহম্মদ বিন কাশিমকে আক্রমণকারী বলে নিন্দা করছেন। সিন্ধুতে আজ যে আন্দোলন চলেছে তা অরবিন্দের

স্বপ্নের অখণ্ড ভারতের কল্পনাকে সার্থক করার দিকে পদক্ষেপ মাত্র।

পশ্চিম পাঞ্জাবও যে পূর্ব পাঞ্জাবের সঙ্গে এক হবার জন্য আগ্রহী তারও নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা আমেদ সলিম নামে একজন পাঞ্জাবি কবিকে কারারুদ্ধ করেছিল। অবিভক্ত পাঞ্জাবের জন্য এই সলিমের ভীষণ আগ্রহ। তিনি ভারতবিভাগকে বর্ণনা করেছেন জীবন্ত দেহে করাত চালানোর সঙ্গে। তাঁর একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন :

''আমি তো সায়গন ও হ্যানয়ের কথা লিখেছি।

আমি দুটি সত্তার কথা বলেছি যারা এক হতে চায়।

আমার নাম সায়গন, না আমার নাম ভিয়েতনাম, কোনো একটি অংশ মাত্র নয় সম্পূর্ণ।

আমার নাম পাঞ্জাবও হতে পারে, পূর্ব পাঞ্জাব কি পশ্চিম পাঞ্জাব সে প্রশ্ন নিরর্থক''।

তাঁর 'ভগৎ সিংহের স্মরণে' কবিতায় তিনি তাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন যারা মনে করে যে ভগৎ সিংহ শিখ এবং তাই মুসলমানদের উচিত নয় তাকে শ্রদ্ধা করা।

শব্দব্রহ্মের শক্তি

শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্ন সার্থক হবেই, কেননা পৃথিবীর ভাগ্য তলোয়ারের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, তা নির্ধারিত হয় শব্দব্রহ্মের দ্বারা, কল্পনার দ্বারা। জাতীয়তা তাঁর কাছে একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ মাত্র ছিল না। তাঁর জাতীয়তা হলো ঈশ্বর প্রেরিত এক দৈব অনুভূতি। তিনি বলেছেন, ''জাতীয়তা হলো ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত একটি ধর্ম।'' ভারতবর্ষকে তিনি এক ঈশ্বরীয় সত্তা বলেই মনে করতেন। এই ভারত হলো মাতৃরূপা মা ভবানী, মূর্তিমতী শক্তি। তিনি বলেছেন, পৃথিবীর অবিরাম ভ্রমণপথে কালচক্রের প্রবাহে যে অসীম শক্তির উদ্ভব ঘটে তা মানুষের দৃষ্টিপথে বহু বিচিত্রভাবে ও অসংখ্য আকারে ধরা দেয়। এক একটি ভাব নিয়ে এক একটি যুগ গড়ে ওঠে। কখনো তিনি প্রেম, কখনো তিনি জ্ঞান, কখনো ত্যাগ, কখনো দয়া। বর্তমান যুগে দেবী আবির্ভূতা হয়েছেন শক্তিময়ী মা হিসেবে।'' তাই অরবিন্দের বাণী ছিল যে, শক্তি ব্যতিরেকে জ্ঞান ও ভক্তি দিয়ে কোনো কাজ হবে না।

তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতের মুক্তিদূত বলে মনে করতেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, ''এখন আমাদের সামনে রয়েছে কঠিনতম কাজ। তা সম্পন্ন করার জন্য চাই অদম্য শক্তিসম্পন্ন মানুষ। বীর, আত্মোৎসর্গে উৎসুক, লৌহকঠিন হৃদয় ও লৌহকঠিন ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন মানুষ, বিপদে নির্ভীক, অক্লান্ত যোদ্ধা, জন্মজাত নেতা, দেশের পরাধীনতা যাঁর আহার-নিদ্রা কেড়ে নিয়েছে এমন মানুষ, মা-কালীর সেবক, মায়ের চরণে যে নিজের হৃৎপিণ্ড উৎপাটন করে দিতে চায়, যাঁর হৃদয়ে আগুন, জিহ্বায় অগ্নিশিখা, যাঁর সামান্য একটি কথায় লোভে সর্বস্ব বিসর্জন দিতে এগিয়ে যাবে— এমন মানুষের জন্য ডাক এসেছে। এই ডাক শীঘ্রই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে।''

যজ্ঞ

তিনি এমন একদল লোক চেয়েছিলেন যারা দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, যাদের একমাত্র চিন্তা ও কাজ হবে এই আন্দোলনকে জাগিয়ে তোলার জন্য কাজ করে যাওয়া। এক অকল্পনীয় প্রচণ্ড বিপ্লব সমাগত, তারাই হবে এর যন্ত্রস্বরূপ। তাদের লক্ষ্য হবে বিরাট, নিঃশঙ্কচিত্তে আত্মাহুতি দেবার জন্য তারা এগিয়ে আসবে। তাদের সেই আত্মাহুতির কাছে প্রাচীনকালের বিরাট যজ্ঞ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। সেই আত্মাহুতির আয়োজন করতে হবে। আমরাই হব তার আহুতি। আমাদের জীবন, আশা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি যা কিছু আমাদের ব্যক্তিগত, যা ভগবানের নয়, তা সবই বিসর্জন দিতে হবে। দেশের কাজে না লাগিয়ে আমাদের ব্যক্তিগত কাজেই এতদিন তাকে লাগিয়ে এসেছি। যারা বড় তাদেরকে আত্মবিসর্জনের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। তবেই যজ্ঞের দেবতা তুষ্ট হবেন।''

অরবিন্দ-দর্শনের প্রখ্যাত যোদ্ধা ঐতিহাসিক দম্পতি অধ্যাপক হরিদাস মুখার্জী ও উমা মুখার্জী তাঁদের একটি গ্রন্থে (শ্রীঅরবিন্দ অ্যান্ড নিউ থট ইন্ডিয়ান পলিটিক্স) লিখেছেন, ''তাঁর নতুন আদর্শকে কর্মে রূপায়িত করার জন্য শ্রীঅরবিন্দ দেশমাতৃকা শক্তিময়ী মা ভবানীর নামে একটি মন্দির কোনো নির্জন স্থানে প্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছিলেন। যারা এই কাজের জন্য এগিয়ে আসবে তাদের আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক শিক্ষা দেবার জন্য তিনি একটি কার্যসূচিও তৈরি করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে একদল 'কর্মযোগী' গড়ে তোলা। মধ্য ভারতে এবং বিন্ধ্যপর্বতের নিকটস্থ অঞ্চলে এই মন্দিরের জন্য উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করতে তিনি লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু যোগ্য স্থান না পাওয়ায় এবং অন্যান্য অভাব থাকায় ভবানী মন্দির ঠিক সেই ভাবে স্থাপন করা গেল না।''

('অর্গানাইজার' পত্রিকা থেকে অনুদিত)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফত বা মানিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফত স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কী বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

নবাঙ্কুর

বিজ্ঞান মঞ্চ

ফুল ফোটে গানে গানে

বুবান মন দিয়ে স্যারের কথা শুনছিল। বিজ্ঞানের স্যার ক্লাস নিচ্ছেন। জীবন বিজ্ঞানের ক্লাস। স্যার পড়াচ্ছিলেন, জীব-জগতের সবাই উত্তেজনায় সাড়া দেয়। সে প্রাণী হোক আর উদ্ভিদই হোক। তবে সাড়া দেওয়ার ধরন সবার আলাদা আলাদা। যে কোনো ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি করলে জীবের মধ্যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়। সেটা হতে পারে স্পর্শের মাধ্যমে, আঘাতের মাধ্যমে বা শব্দের মাধ্যমে। যেমন, আমরা যদি কোনো জীবকে আঘাত করি তাহলে সে উলটে আঘাত করবে নয়তো পালিয়ে যাবে। আবার যদি লজ্জাবতী লতাকে ছুঁয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে তার পাতাগুলি বন্ধ করে নেবে।

বুবানের মনে মনে খুব আনন্দ হলো। সে তো রোজ স্কুল থেকে ফেরার পথে লজ্জাবতী লতাকে ছুঁয়ে দেয়। আর তারা লজ্জায় পাতাগুলি গুটিয়ে নেয়। কিন্তু এতদিন সে তার কারণ জানত না। আজ সেটা জানতে পেরে কেমন যেন

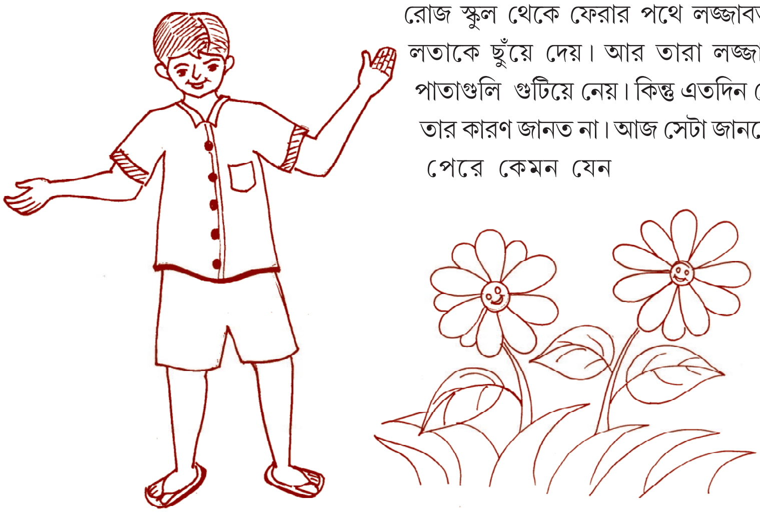

রোমাঞ্চ লাগছে। উত্তেজনার বসে পড়ানোর মাঝেই বুবান স্যারকে একটা প্রশ্ন করে বসল— স্যার, তাহলে শব্দের উত্তেজনায় জীব কীভাবে সাড়া দেয়? বিজ্ঞানের স্যার অমূল্যরতনবাবু ছাত্রদের খুব স্নেহ করেন। খুশি হয়ে বুবানকে তিনি বিষয়টা বুঝিয়ে দিলেন—ধরো তোমার ভাইকে তুমি খুব জোরে একটা ধমক দিলে, সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ে চমকে উঠবে। আবার কখনোও যদি গান গাও তাহলে দেখবে কিছু না বুঝেই সে তোমার গানের তালে তাল দিচ্ছে, মাথা দোলাচ্ছে। শব্দের ভাষা না বুঝলেও শব্দের তরঙ্গ তার মধ্যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে।

ছুটির পর বুবান ছুটতে ছুটতে বাড়ি এলো। আজ সে অনেক কিছু জেনেছে। ফেরার পথে রাস্তার লজ্জাবতীর পাতাগুলিকে ছুঁয়ে দিয়ে এসেছে। প্রথম পরীক্ষা সফল। এবার বাড়িতে ফিরেই ভাইকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে দিল। ওর ভাই গুল্লু সবে হাঁটতে শিখেছে কিন্তু ভাল করে কথা বলতে পারে না। বুবান প্রথমে হাত দুলিয়ে গান গাইতে শুরু করল। একটা ফোকলা হাসি হেসে ভাইও মাথা দুলিয়ে তালি বাজাতে লাগল। এবার সে গান থামিয়ে ভাইকে জোরে একটা ধমক দিল। ভাই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। বুবানের এই পরীক্ষাও সফল। এবার দেখতে হবে শব্দের উত্তেজনায় উদ্ভিদ কীভাবে সাড়া দেয়?

বুবান দৌড়ে বাগানে চলে এলো। নানা কায়দা করে ফুলগাছগুলোকে ধমকালো। কিছুই হলো না। এবার সে গান ধরল। তাতেও কিছু হলো না। তাহলে স্যার যে বললেন.............? বুবানের মন খারাপ হয়ে গেল। কিছু ভাল লাগছে না, কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে।

সন্ধেবেলা গুরুজী এলেন গান শেখাতে। বুবানের তখনোও অস্বস্তি কাটেনি। গানে মন দিতে পারছে না। গুরুজী সেটা বুঝতে পারলেন। বললেন— বুবান কী হয়েছে, গানে মন দিচ্ছ না যে? বুবান আর চেপে রাখতে পারল না, বলল— গুরুজী গানে কি গাছ সাড়া দেয়? গুরুজীর মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠলো। মৃদু হেসে বললেন— হ্যাঁ, দেয়। কিন্তু সবার গানে দেয় না। সঙ্গীতে যারা উচ্চমার্গে উঠেছেন তাদের গানে উদ্ভিদ সাড়া দেয়।

আপনার গানে গাছ সাড়া দেয়? —বুবান বলল। গুরুজী এবারও হাসলেন, বললেন— না আমার গানে কখনো দেয়নি। কিন্তু শোনা যায় সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন যখন গান ধরতেন তখন নাকি কুঁড়িতে ফুল ফুটত, আকাশে মেঘ ঘনিয়ে বৃষ্টি নামত, ময়ূর পেখম তুলে নাচত। আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন বাঁশী বাজাতেন তখন বৃক্ষরাজি তার মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করত। এসব বৈজ্ঞানিক সত্য, গল্প কাহিনি নয়। গানের তরঙ্গে গাছেদের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং ফলে তার নানাপ্রকার বহিঃপ্রকাশ হয়।

গুরুজীর কথা শুনে বুবানের মন শান্ত হলো। বলল— আমার গানে গাছেরা সাড়া দেবে, কুঁড়িতে ফুল ফুটবে? গুরুজী বুবানের মাথায় হাত রেখে বললেন— তুমি যদি সঙ্গীতকে সাধনা হিসেবে নাও তাহলে নিশ্চয়ই তোমার গানেও গাছে ফুল ফুটবে।

পরের দিন বাবাকে বলে বুবান আরোও কিছু গাছ আনিয়ে নিল। পড়াশুনার পাশাপাশি গুরুজীর কাছে নিয়মিত তালিম নিতে লাগল গানের। সঙ্গীত যেন তার সাধনা হয়ে উঠল। বুবানের বিশ্বাস একদিন তার গানেও গাছ সাড়া দেবে, গাছে ফুল ফুটবে। এটা হতেই হবে, নইলে যে স্কুলে স্যারের পড়ানোটা মিথ্যে হয়ে যাবে!

বিরাজ নারায়ণ রায়

অঙ্কন : দিশা রায়

মনীষী কথা

আবদুল কালাম

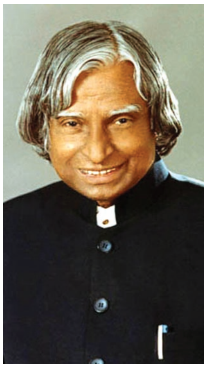

গত ২৭ জুলাই প্রয়াত হয়েছেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম। তিনি মিসাইল ম্যান নামেও পরিচিত। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কালাম ২০০২ সালে ভারতের ১১ তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ১৯৯৮ সালে পোখরান-২ পরমাণু পরীক্ষায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তার জন্ম ১৯৩১ সালের ১৫ অক্টোবর, তামিলনাড়ুতে। পুরো নাম—আবুল পাকির জৈনুলআবেদিন আবদুল কালাম। তিনি পদার্থবিদ্যা ও এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশুনা করেন। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে সায়েন্স অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন তিনি। গবেষণার পাশাপাশি লেখালেখিও চালিয়ে গেছেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ নাগরিক সম্মান ভারতরত্ন দেওয়া হয় তাকে। বিজ্ঞান গবেষণাকে তিনি রাষ্ট্রসেবার ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্নবাণ

১.'গুপী গাইন বাঘা বাইন'—সিনেমাটির পরিচালক কে?

২.'বাটুল দি গ্রেট'—কার রচনা?

৩.গোপাল ভাঁড় কোন্ রাজার ভাঁড় ছিলেন?

৪.'টিনটিন'-এর কুকুরটির নাম কি?

৫.'ছোটা ভীম'—ধারাবাহিক কোন্ সাল থেকে শুরু হয়।

উত্তর : ১. সত্যজিৎ রায়। ২. নারায়ণ দেবনাথ। ৩. রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। ৪. স্নোয়ী। ৫. ২০০৮।

ছবিতে অমিল খোঁজ

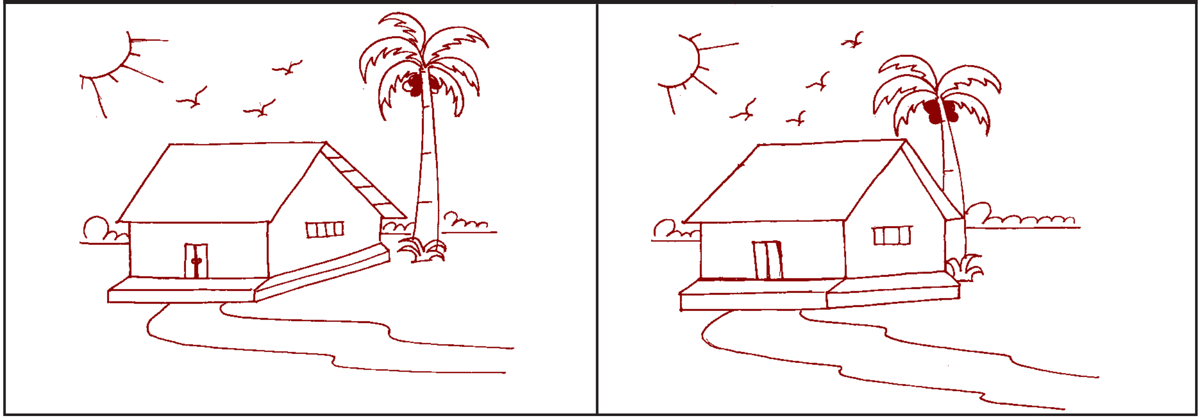

ছোটদের কলমে

বৃষ্টি

ত্রিদিব রায়, সপ্তম শ্রেণী

বৃষ্টি পড়ে ঝমঝমিয়ে
আঁধার নেমে আসে
বাতাস বহে ঝড় ওঠে
আকাশ ডেকে ওঠে।
নদী পুকুর সব ভরে যায়
জেলেরা জাল ফেলে
ইলিশ গলদা উঠলে জালে
আনন্দেতে নাচে।

বৃষ্টি বৃষ্টি দুপুর হলে
সূর্য যে না ওঠে
রান্নাঘরে মা ঠাকুমা
খিচুড়ি ইলিশ রাঁধে।
সন্ধ্যে হলেই ঝুপুস করে
অন্ধকার সব দেয় মিলিয়ে
ভূত মামারাও বেরিয়ে আসে
ঠাকুমার ঝুলি থেকে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

‘কর্মরতা পাত্রী চাই’

শবরী ঘোষ

ঘটনাটা শুনেছিলাম এক বান্ধবীর মুখে। তার বিবাহযোগ্যা দিদির জন্য তখন পাত্র দেখা চলছে। দিদি একজন স্কুল শিক্ষিকা, কর্মসূত্রে থাকেন উত্তরবঙ্গে। বিজ্ঞাপন দেখে এক পাত্রের পরিবার তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ছেলেটি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তার বাবা পণ হিসাবে দাবি করেছিলেন নতুন ফ্ল্যাট সাজাবার যাবতীয় ফার্নিচার, ১০০ গ্রাম সোনার গহনা এবং পাত্রীর সম্পূর্ণ এক বছরের মাহিনা। এই অসম্ভব দাবি শুনে পাত্রীর বাড়ির লোকেরা বেঁকে বসে। তখন ছেলেটি ফোন করে জানাল যে, তার বাবা সেকেলে মানুষ। চিন্তাভাবনাও প্রাচীনপন্থী। কিন্তু সে আধুনিক এবং প্রগতিশীল। পণ দেওয়া-নেওয়ার বিষয়ে তার ঘোর আপত্তি। সে নগদ টাকাপয়সা অথবা গহনা— এর মধ্যে কোনোটাই নেবে না। তবে পাত্রীর পরিবার যদি তাদের মেয়েকে উপহার হিসাবে কিছু দিতে চায় তাহলে তা দিতে পারে।

ছেলেটির আশ্বাস পেয়ে বান্ধবীর পরিবার আবার তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ছেলেটির বাবা তখন বললেন যে, ছেলে তাঁকে অনেক বুঝিয়েছে। তিনি পুরনো দাবি থেকে সম্পূর্ণ সরে এসেছেন। নগদ টাকা পয়সা তিনি আর দাবি করবেন না। তবে পাত্রীপক্ষ বিয়েতে খাট, আলমারি, ফ্রিজ, টিভি ইত্যাদি যে উপহারগুলি দেবেন তা যেন তাঁর ছেলের পরামর্শ এবং পছন্দ অনুসারে কেনা হয়। তাছাড়া বিয়ের সময় পাত্রীকে একটি স্ট্যাম্প পেপারে এই মর্মে লিখে সই করে দিতে হবে যে, মাইনের টাকা বিয়ের পর থেকে উত্তরবঙ্গে তার বাড়ি ভাড়া, খাওয়া ও স্কুলে যাতায়াতের খরচ ব্যতীত সম্পূর্ণ অর্থ কলকাতায় তার স্বামীর হাতে তুলে দিতে হবে। পাত্রীর পরিবারের তখন চক্ষু চড়কগাছ! বান্ধবীর দিদি তৎক্ষণাৎ ওই বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

কিছুদিন আগে টিভি-তে একটি নতুন ধারাবাহিকের প্রোমোতে দেখানো হচ্ছিল যে, বর্তমানে পণপ্রথা উঠে গেছে। তার পরিবর্তে পাত্রপক্ষের এক নতুন দাবির সংযোজন হয়েছে— ‘কর্মরতা পাত্রী চাই’। অর্থাৎ ভাবী বধূ তাঁর মাইনের পুরোটা অথবা অধিকাংশই স্বামীর পরিবারের হাতে তুলে দেবেন। আমার মনে হয়, বধূ তার নিজস্ব উপার্জিত অর্থ কীভাবে ব্যয় করবেন সেটা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার পরিচিত অনেক পরিবারে এবং আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যেও দেখেছি যে, একটি মেয়ের উপার্জনের সামান্যতম অংশটুকুও তার শ্বশুরবাড়ির মানুষজন দাবি করেননি। মেয়েটি স্বেচ্ছায় তাদের জন্য সেই অর্থ ব্যয় করেছে। এটাই তো স্বাভাবিক সম্পর্ক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন পরিবারের সংখ্যা খুবই কম।

কেউ কেউ বলবেন, বর্তমানে জিনিসপত্রের মূল্য এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, একটি ছেলের একার উপার্জিত অর্থে সংসার চালানো খুব কঠিন। তাছাড়া সংসার মানে তো সেখানে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেরই সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই কথাটা সর্বাংশে সত্য। কিন্তু এটাও ভেবে দেখা উচিত যে, বর্তমান যুগে বহু পরিবারেই একটিমাত্র কন্যাসন্তান থাকে। সেই মেয়েটি হয়তো বিয়ের পরেও বৃদ্ধ পিতামাতার জন্য তার উপার্জিত অর্থ ব্যয় করতে চায়। পিতা-মাতার যদি পেনশন বা অর্থ উপার্জনের অন্য কোনো উপায় না থাকে তাহলে মেয়ের মাইনের উপর তাঁদের নির্ভর করতে হবেই। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তাঁরা জামাতা বা তার পরিবারের দ্বারা অপমানিত হয়েছেন এই ভাষায়, ‘ভিখিরি কোথাকার! মেয়ের পয়সায় খেতে লজ্জা করে না?’ একটি ছেলে যদি তার মা-বাবা এবং পরিবারের অন্যান্যদের জন্য অর্থ ব্যয় করে তাতে দোষ নেই, তাহলে মেয়েটির ক্ষেত্রে তা দোষ হবে কেন? পিতা-মাতার সেবা করার মতো পবিত্র কর্তব্যের ক্ষেত্রেও লিঙ্গবৈষম্য? তাছাড়া সংসার যখন দু'জনেরই তখন মেয়েটির পরিবারও নিশ্চয়ই তার অন্তর্ভুক্ত।

সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপনে চোখ পড়েছিল। একটি অত্যন্ত নামি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত এক তরুণ, যার মাসিক উপার্জন হলো ৪২০০০ টাকা এবং পিতা সরকারি পেনশন-ভোগী, নিজের জন্য ‘কর্মরতা পাত্রী’ দাবি করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, সরকারি চাকুরে অগ্রগণ্য। বিজ্ঞাপনে নিজের দ্বিতল বাড়ির কথাও সগর্বে জানিয়ে দিয়েছেন। একটি বহু প্রচলিত প্রবাদ বাক্যকেই তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন— ‘Sky is the limit’। তাছাড়া, বেসরকারি সংস্থা থেকে তিনি নিজে কোনোদিন ছাঁটাই হয়ে গেলেও স্বর্ণডিম্বপ্রসবিনী হংসী থুড়ি স্ত্রীর নিরাপদ চাকুরিটা তো থাকছেই!

শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ের পরে অলসভাবে শুধু ঘরে বসে থাকবে কেন? তার বদলে সম্মানযোগ্য চাকুরি করতে পারে— এই ভাবনায় দোষের কিছু নেই। কিন্তু স্ত্রীর অর্থই যদি স্বামী বা তার পরিবারের একমাত্র লক্ষ্য হয় তবে সেই পরিবারে মেয়ের বিয়ে না দেওয়াই শ্রেয়।

গুরুদাসপুরে জঙ্গি হামলায় আমরা হতচকিত

হায়! সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটে গেলেও আমরা ভবিষ্যৎ হামলার প্রস্তুতি তো নিই-ই না, আবার অভিজ্ঞতা থেকেও কোনো শিক্ষা গ্রহণ করি না।

অতিথি কলম

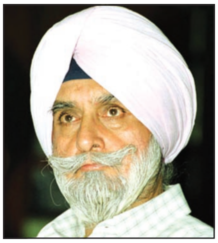

কে পি এস গিল

সাম্প্রতিক গুরুদাসপুরের দিননগরে সন্ত্রাসবাদী হামলা ও মৃত্যুকে ঘিরে মিডিয়াতে খুবই চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। প্রথমত, গুরুদাসপুরে পুলিশ চৌকি খুবই তাড়াতাড়ি জানিয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা পাকিস্তান থেকে এসেছিল ও তাদের সঙ্গে থাকা রাত্রিতে দেখার বৈদ্যুতিন সরঞ্জামগুলিতে আমেরিকায় তৈরি হওয়ার ছাপা ছিল।

দ্বিতীয়ত, ভারত পাকিস্তান দু' দেশের নিরাপত্তা আধিকারিকদের (এন এস এ) মধ্যে জারি থাকা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদী হামলা শীর্ষ গুরুত্বের বিষয় হয়ে উঠেছে।

আদতে দু'টি বিষয়ই এই আক্রমণের কারণে সামনে আসা মূল আশঙ্কার ধারে কাছেও আসে না। হ্যাঁ, তদন্ত কমিটির কাজকর্ম বরাবরের মতোই এগিয়ে চলেছে এবং তাদের ভবিষ্যৎ রিপোর্টে এই কাজ যে পাকিস্তানি মদতেই হয়েছে তাও উল্লেখিত হবে এমনটা আমরা আন্দাজ করতেই পারি। পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ভাবে বিগত ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে নিরবচ্ছিন্ন ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে আসছে। এই পাহাড়প্রমাণ দুষ্কর্মের অজস্র প্রমাণ তাদের হাতে তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মানুষকেও জানানো হয়েছে। কিন্তু এতে কারুর ওপরই কোনো প্রভাব পড়েনি। ভারতের পাশে কেউই আসেনি। তাই ভারতকে নিজেকে রক্ষা করার কৌশল সব নিজেকেই শিখতে হবে। সত্যি কথা বলতে কী দ্বিপাক্ষিক আলোচনা একটা প্রবহমান বস্তুতে পরিণত হয়েছে যার কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। যাকে বলে কথা বলতে হয় বলা।

ভেবে দেখুন, নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের পক্ষে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ওপর বিশেষ আশা রাখা হয়েছিল, বা সাম্প্রতিক মোদী-নওয়াজ শরিফ আলোচনার পরিণতিতে কী হলো? দীর্ঘ অতীত থেকেই আলোচনা ও আলোচনা ভেঙে যাওয়ার এক পরম্পরা তৈরি হয়েছে।

তাই বলছি এর থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যার ওপর এখনই নজর দেওয়া দরকার। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে গুরুদাসপুরের মতো একটি সংবেদনশীল সীমান্ত জেলায় আমাদের প্রত্যাক্রমণের প্রস্তুতি কতটা দুর্বল ছিল। বিশেষ করে এমন একটি রাজ্য যেখানে অতীতে দীর্ঘ তেরো বছর ধরে রক্তক্ষয়ী ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস কায়েম ছিল। আবার এই রাজ্যটি আরও এমন একটি রাজ্যের লাগোয়া যেখানে গত ২৬ বছর ধরে পাকিস্তান ছায়াযুদ্ধ জারি রেখেছে। সংবাদসূত্র অনুযায়ী দিননগরের হামলার সময় Special Weapons and Tactics (SWAT) নিরাপত্তাবাহিনী একেবারে বাধ্যতামূলক আত্মরক্ষার সরঞ্জামগুলিও পরে ছিল না। লক্ষ্য করে দেখেছি যতক্ষণ কোনো মহাবিপদ অর্থে শিরে সংক্রান্তি না আসে এই সংস্থাগুলিকে (SWAT) অবহেলার মাধ্যমে ক্ষয়ের পথে ঠেলে দেওয়া হয়। অনেক সময় বলা হয় সরকারের আর্থিক সঙ্গতি নেই। আবার বহুক্ষেত্রে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা মাথাচাড়া দেয় বা কেবলমাত্র চরম অবহেলার মাধ্যমে ধ্বংসের পথে পরিচালনা করা হয়। এখন স্মরণে আনা দরকার, আশি থেকে নব্বই দশকের মধ্যবর্তী সময়ে পাঞ্জাব পুলিশকে কীভাবে এক নিপুণ বাহিনীতে পরিণত করা হয়েছিল যাতে তারা সন্ত্রাসবাদীদের বিপক্ষে সমান ক্ষিপ্রতায় মোকাবিলা করতে পারে। প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও প্রত্যেকটি থানায় আলাদা সুরক্ষা, যানবাহন ও সেই সময়ে লভ্য এমন ধরনের প্রযুক্তিগত সহায়তার ব্যবস্থাও ছিল। যাতে তারা নিজেদের সীমার মধ্যে যে কোনো চ্যালেঞ্জের প্রত্যাঘাত করতে পারে। একটা ব্যাপার দিনের আলোর মতো

> “‘দিননগরের’ ঘটনা ভবিষ্যতের বহু ঘটনার আগাম ইঙ্গিতমাত্র। আমাদের দেশের ও বিশ্বব্যাপী পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক আর পাঞ্জাব এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিপদসঙ্কুল রাজ্য। পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন সমস্ত পুলিশ থানাগুলিকে পর্যাপ্ত শক্তিশালী করা একান্ত প্রয়োজন।”

পরিস্কার হয়ে গেছে। সেই যত্নে তৈরি পরিকাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেই সময়ে সন্ত্রাসবাদ যখন চরম সীমায় পৌঁছেছিল তখনকার কিছু অসমসাহসী কর্মী যাঁরা আজও কর্মরত আছেন তাঁরা না থাকলে আমাদের প্রতিরোধের হয়ত কোনো অস্তিত্বই থাকত না।

অভিজ্ঞতা থেকে জানি বিপদের সময়েও নিরাপত্তা বাহিনীকে শুধুমাত্র বুনিয়াদি উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম যোগাড় করতে সরকারের কাছে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়। স্পষ্ট করেই বলছি, আমার মতে অসামরিক প্রশাসনের (Civil bureaucracy) পক্ষে এই ক্ষেত্রে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আজ ভাগ করে নিয়ে বলতে পারি, পাঞ্জাবে চরম সন্ত্রাসবাদের পরিস্থিতিতে আমি চণ্ডীগড় ও দিল্লীর উভয় মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেই তুমুল সংঘাতে জড়িয়ে পড়ি। সন্ত্রাসবাদীদের লাগাতার চোরাগোপ্তা ও প্রকাশ্য আক্রমণের মোকাবিলায় বারবার বুলেট প্রুফ গাড়ির জন্য আবেদন জানাই। আমার কোনো অনুরোধই গ্রাহ্য করা হয়নি। এই মরিয়া পরিস্থিতিতে আমরা নিজেদের মতো আত্মরক্ষায় নামতে বাধ্য হই। কিছু পরিত্যক্ত প্রায় বাতিল অ্যাম্বাসাডার গাড়িকে আমরা কোনোক্রমে বুলেট প্রুফে রূপান্তরিত করি। এগুলি আমাদের প্রচণ্ড উপকারে আসে। আমরা মোকাবিলায় সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করি। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। সরকারি নিরীক্ষণ সংস্থা আমাদের দু' লক্ষ টাকা গাড়ি প্রতি খরচ করার অনুমোদন দিতে চাননি। অথচ এর পরে পরেই প্রতিটি গাড়ি ৬ লক্ষ টাকার বেশি দিয়ে অনায়াস অনুমোদনের মাধ্যমে কেনা হয়।

এই হচ্ছে আমাদের প্রতিভাবান অসামরিক আমলাতন্ত্রের নমুনা। ঠিক একইভাবে 'দিননগর' এনকাউন্টারের ক্ষেত্রেও সন্ত্রাসবাদীদের কব্জা করা বাড়ি তাদের দখলমুক্ত করার লড়াইয়ে পুলিশকে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে বুলেটপ্রুফ গাড়ি ধার করে আনতে হয়েছে।

মনে পড়ে তৎকালীন খালিস্তানিরা যখন পাকিস্তানি মদতে হাতে এ কে-৪৭ পেয়েছিল, তখন আমাদের পাঞ্জাব পুলিশের হাতে ছিল প্রায় তাঁবাদি হয়ে যাওয়া ৩০৩ বোল্ট অ্যাকশন রাইফেল। এই পরিস্থিতিতে আমরা যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো উপযুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র চাইলাম তখন আমলাতন্ত্র এককাট্টা হয়ে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের জনৈক জয়েন্ট সেক্রেটারি লিখলেন পুলিশের মতো চরিত্রগতভাবে অসামরিক বাহিনীর হাতে এই ধরনের অস্ত্র কোনো মতেই তুলে দেওয়া যায় না। চরম ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা বুঝলেন না এগুলিকে লাগাতার বিক্ষোভ দমন করার ক্ষেত্রে প্রদর্শন করা যেতে পারে। এমন নয় যে প্রত্যেক পুলিশকর্মীর হাতে বাধ্যতামূলকভাবে একটা করে এ কে-৪৭ তুলে দেওয়া হবে।

একটা কথা কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছে না যে সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটে গেলে তারপর প্রস্তুতি নেওয়াটা অর্থহীন। বাহিনীকে সদাসর্বদা যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য তৈরি থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র আমার (পাঞ্জাবের) ওপর কত আক্রমণ বা কী ধরনের আক্রমণ হয়েছে সেটাই শেষ কথা নয়। দেশের নানান রাজ্যই ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের কবলে পড়েছে। আশ্চর্যের কথা, সব রাজ্যই এক সুরে বলছে কেন্দ্র আমাদের যথাযথ সজাগ করেনি, গোয়েন্দা সহায়তা দেয়নি বা আর্থিক সাহায্যও করেনি। মনে হয় যেন রাজ্যগুলির কোনো দায়ই নেই। অথচ যদি কখনো কেন্দ্র সব দেখে শুনে সংবিধানের অন্তর্গত আইন-শৃঙ্খলার ভার রাজ্যগুলির একান্ত (সঠিক বটেই) অধিকারে কোনো নড়চড়ের প্রসঙ্গ তোলে তখন সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীই এক সুরে প্রতিবাদ করে ওঠেন।

মনে পড়বে পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদের চরম সময়ে গোটা পাকিস্তানের লাগোয়া সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা হয়েছিল। রাতদিনের নজরদারি ও বড় দল নিয়ে ঘন ঘন পেট্রোলিং-এর ফলে সরাসরি অনুপ্রবেশ প্রায় শূন্যের স্তরে নেমে এসেছিল। সামান্য কিছু ঘটলেও (অনুপ্রবেশ) তাকে সামলে দেওয়ার পর্যাপ্ত সামর্থ্য আমাদের ছিল। কিন্তু আজও সেই বেষ্টনী রয়েছে কিন্তু সেখানে নজরদারিতে চরম ঢিলেমি এসে গেছে। রাজনৈতিক দাদাদের মদতে ভয়ঙ্কর বেড়ে গেছে পাকিস্তান থেকে মাদকের চোরা চালান ও নানান নিষিদ্ধ বস্তুর আমদানি। আর এরই সঙ্গে কিছু পুলিশকর্মী ও আধা সামরিকবাহিনীর লোকজনের যোগসাজশে এই সংবেদনশীল সীমান্ত দিয়ে নিয়মিত শত্রুপক্ষের লোকজন ঢুকে পড়ছে।

অবশ্যই কেন্দ্রের সরকারকেও এর জন্য খানিকটা দায়ী করা যায়। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মদত দেওয়ার প্রশ্নে পাঞ্জাবকে গুরুত্বের তালিকায় নিচের দিকে নামানো হয়েছে। শুধু তাই? কেন্দ্রের পুলিশবাহিনীর আধুনিকীকরণের প্রকল্পের তালিকাতেও পাঞ্জাব পুলিশকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। এগুলি সবই এই সরকারের আমলে। কিন্তু আই বি-র পক্ষে বরাবর সাবধান করে বলা হচ্ছে পাঞ্জাব কিন্তু একটি 'সংবেদনশীল রাজ্য'।

আমার মনে হয় 'দিননগরের' ঘটনা ভবিষ্যতের বহু ঘটনার আগাম ইঙ্গিতমাত্র। আমাদের দেশের ও বিশ্বব্যাপী পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক আর পাঞ্জাব এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিপদসঙ্কুল রাজ্য। পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন সমস্ত পুলিশ থানাগুলিকে পর্যাপ্ত শক্তিশালী করা একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বাহিনীর নৈতিক বলও বৃদ্ধি করা দরকার। এই সূত্রে বলি, বেশ কিছু নির্ভীক পুলিশ অফিসার যারা অতীতের সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে লড়েছিল তাদের অনেকেই জেলে পচছে। আবার বেশ কিছুর বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধিমূলক মামলা চালানো হচ্ছে। এগুলির কোনটিই বাহিনীর মনোবল চাঙ্গা রাখার পক্ষে সদর্থক নয়।

সারা পৃথিবীতে আজ ইসলামি সন্ত্রাসবাদের ছায়া ঘনায়মান। তাই সময় পেরিয়ে যাওয়ার আগে দায়িত্ববান নাগরিকরা, প্রচারমাধ্যম, রাজনীতির বাবুরা প্রত্যেককেই এক জোট হয়ে এর বিরুদ্ধে পরিকল্পনা, যে কোনও কৌশল বা প্রযুক্তি যা যার হাতে থাকুক না কেন সবকিছুকেই সামনে নিয়ে আসতে হবে। হৈহট্টগোল আর আলোচনায় কিছু হবার নয়।

ভারত তার রত্নকে হারাল

নরেন্দ্র মোদী

ভারত তার মহামূল্যবান এক রত্নকে হারাল, কিন্তু সেই রত্নের দ্যুতি ভারতকে তার স্বপ্নের গন্তব্য— জ্ঞানের মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের প্রথম সরণিতে জায়গা করে নেওয়া— এর জন্য আমাদের পথপ্রদর্শন করবে। আমাদের বিজ্ঞানী রাষ্ট্রপতি তথা আপামর জনগণের অকুণ্ঠ প্রশংসা আর ভালোবাসা পাওয়া মানুষটি কখনও পার্থিব প্রাপ্তি দিয়ে সাফল্যকে বিচার করেননি। তাঁর কাছে দারিদ্র্য মোকাবিলা করার কৌশল ছিল বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক স্তরে জ্ঞান ভাণ্ডারের উন্মোচন। একদিকে যেমন আমাদের প্রতিরক্ষা কর্মসূচির নায়ক হিসেবে ভাবনার পরিসরকে ভিন্ন স্তরে উন্নীত করেছেন, তেমনি অন্যদিকে চৈতন্যের মূর্ত স্বরূপে ধর্মীয় ভেদাভেদের সংকীর্ণ বেড়াজাল ভেঙে সমন্বয়ের অতিন্দ্রিয় পরিসরে উন্মুক্ত হতে পেরেছিলেন। প্রতিটি মহান জীবনই এক একটা 'প্রিজম'-এর মতো যার মধ্যে দিয়ে বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মিতে আমরা সিক্ত হই।

বাস্তববাদী শক্ত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর সুগভীর ভাবাদর্শ ছিল সন্দেহাতীত। প্রত্যেক বঞ্চিত শিশুই কঠোর বাস্তববাদী হয়ে ওঠে। দারিদ্র্য তার মনের কল্পনাকে কেড়ে নেয়। বস্তুত দারিদ্র্য তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ যা তাকে স্বপ্ন দেখতে শেখার আগেই পরাভূত করতে পারে। কিন্তু কালাম মহোদয় কখনও পরিস্থিতির কাছে মাথা নত করেননি। বাল্যকালে পড়াশুনার খরচ চালানোর জন্য তাঁকে খবরের কাগজ ফেরি করে অর্থ উপার্জন করতে হয়েছে। অথচ আজ একই সংবাদপত্রের পাতার পর পাতা তাঁর শোকসংবাদে পরিপূর্ণ! তাঁর জীবন যে কারোও কাছে একটি আদর্শ জীবনের উদাহরণ হতে পারে একথা বলার ধৃষ্টতা তাঁর নেই বলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন। তবে যেখানে দরিদ্র শিশুরা দুরূহ ও অবহেলিত সমাজের মধ্যে বেড়ে ওঠে আর এটাকেই তাদের ভাগ্যলিখন বলে মেনে নিয়ে সান্ত্বনা খোঁজে, সেখানে তাঁর উদাহরণ হয়তো সেইসব শিশুদের এই অলীক অনগ্রসরতা এবং অসহায়তার দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে। এইসব শিশুদের মতো তিনি আমারও মার্গদর্শক। তাঁর নৈতিক বল, নিষ্ঠা ও অনুপ্রেরণা জাগানো কল্পনাশক্তি তাঁর জীবনের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। অহমিকা যেমন তাঁর জীবনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি, তেমনি অত্যধিক প্রশংসাতেও তিনি ছিলেন নিরুত্তাপ। তিনি যেমন বিদগ্ধ মন্ত্রীর মতো সুশীল সমাজের শ্রোতাদের সামনে সাবলীল ছিলেন, তেমনি ছোট ছোট ছাত্রদের মাঝেও তিনি ছিলেন সমান স্বচ্ছন্দ। তাঁর মধ্যে শৈশবের সারল্য, তারুণ্যের প্রাণশক্তি ও প্রাপ্ত-বয়সের পরিপূর্ণতার অনুপম সংমিশ্রণ ঘটেছিল, যে গুণটি তাঁর প্রতি মানুষজনকে প্রথমেই আকৃষ্ট করতো।

পার্থিব এই জগত থেকে তিনি খুব কমই নিয়েছেন, আর সমাজকে একজন মানুষ যা যা দিতে পারে, সেসবই তিনি দিয়েছেন। গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মানব সভ্যতার তিনটি মহান গুণ— 'দম' (আত্মসংযম)— 'দান' (আত্মোৎসর্গ)--- 'দয়া' (পরদুঃখকাতরতা)- র মূর্তস্বরূপ ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর এই ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ছিল উদ্যমাগ্নিতে বলীয়ান। তাঁর দেশভাবনা স্বাধীনতা, বিক্রম আর উন্নয়নের সুতোয় গ্রথিত ছিল। আমাদের ইতিহাস বলছে যে, আমাদের স্বাধীনতা একটি রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে ঘটেছে, কিন্তু এর মধ্যে মনের স্বাধীনতা ও মেধার বিকাশও জড়িত ছিল। অনুন্নয়নের হাত থেকে তিনি দেশকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং সার্বিক অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে দেশ থেকে দারিদ্র্যের অভিশাপ দূর করতে চেয়েছিলেন। সুবিবেচনা-প্রসূতভাবে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে রাজনীতিকদের তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ৩০ শতাংশ এবং দেশের উন্নয়নে ৭০ শতাংশ সময় ব্যয় করা উচিত। বিভিন্ন রাজ্য থেকে সাংসদদের তলব করে এনে তাঁদের এলাকার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়শই এই পরামর্শ তিনি তাঁদের দিতেন। বৈরি মনোভাব থেকে নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তি থেকেই উৎপন্ন হয়েছিল তাঁর চরিত্রের এই দৃঢ়তা। একটি অসুরক্ষিত জাতি কখনই তার সমৃদ্ধির দ্বারা উন্মোচন করতে পারে না। পরমাণু ও মহাকাশ গবেষণায় তাঁর সিদ্ধিলাভ ভারতকে তার ভূখণ্ড এবং বহির্বিশ্বে অবস্থান সম্পর্কে প্রত্যয়ী হবার শক্তি জুগিয়েছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির

উন্নয়নে দীর্ঘকাল ধরে তাঁর নব নব উদ্ভাবন এবং প্রকৃতির ভয়ানক শক্তিকে সদর্থক এবং হিতকর উপায়ে ব্যবহার করতে আমাদের সক্ষম করে তোলবার তাঁর প্রচেষ্টাকে স্মরণ করাই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রায়শই লোভ আমাদেরকে প্রকৃতির ঘাতক বানিয়ে ফেলে।

কালাম মহোদয় একদিকে যেমন গাছের মধ্যে কাব্য খুঁজে পেয়েছিলেন, তেমনি অন্যদিকে জল, বায়ু, সূর্যকিরণের মধ্যে নিহিত শক্তিকে কাজে লাগাবার কথা ভেবেছেন। তাঁর চোখ দিয়ে বিশ্বদর্শন এবং অনুরূপ অভিপ্রায়মূলক ঐকান্তিকতার শিক্ষা আমাদের নেওয়া উচিত। মানুষ তার প্রবল ইচ্ছাশক্তি, অসীম মনোবল, সক্ষমতা ও অধ্যবসায় দিয়ে নিজের জীবন গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু আমরা কোথায় জন্মগ্রহণ করব এবং কখন ও কীভাবে আমাদের মৃত্যু ঘটবে তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তথাপি কালাম মহোদয় যদি এই সুযোগ পেতেন, তবে তিনি হয়তো ক্লাসভর্তি তাঁর প্রাণের প্রিয় ছাত্রদের সামনে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, চিরবিদায় জানাতে পছন্দ করতেন। অকৃতদার হবার কারণে তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। কিন্তু এটা হয়তো সর্বৈব সত্য নয়। উপযুক্ত শিক্ষাদান করে, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে, উদ্দীপিত করে, রোমাঞ্চিত করে, যেখানে যত অন্ধকার নজরে এসেছে তা তাঁর দিব্যজ্যোতিতে আলোকিত করে এবং কোনো বিষয়ে ডুবে থাকার অসীম আগ্রহে তিনি প্রতিটি ভারতীয় শিশুর জনক হয়ে উঠেছেন। তিনি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন এবং আমাদের পথনির্দেশ করিয়েছেন। গতকাল যখন সেই ঘরটিতে আমি প্রবেশ করছিলাম যেখানে তাঁর নিষ্প্রাণ দেহটি শায়িত ছিল, দেখলাম দরজায় তাঁর ছবি টাঙ্গানো যাতে শিশুদের অনুপ্রেরণা দেওয়া তাঁর রচিত, 'ইগনাইটেড মাইন্ড' বইটির কিছু লাইন উদ্ধৃত রয়েছে। তাঁর মহৎ কীর্তি তাঁর কবরে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাবার নয়, বরং তাঁর স্মৃতি শিশুরা তাদের মনের মণিকোঠায় আজীবন সযত্নে রক্ষা করবে যা তারা আবার তাদের সন্তানদের উপহার হিসেবে দেবে।

(সৌজন্যে : টাইমস অব ইন্ডিয়া,
অনুবাদক : দিব্যজ্যোতি চৌধুরী)

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street,
Kolkata - 700 016

M : 98311 85740, 98312 72657,

Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

ইয়াকুবের ফাঁসি নিয়ে এত বিতর্ক কেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ইয়াকুব মেমনের ফাঁসির আগে ও পরে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। যদিও অধিকাংশ মানুষ মনে করেন ১৯৯৩-এর মুম্বই ধারাবাহিক বিস্ফোরণে অভিযুক্ত ইয়াকুব মেমনের মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। মেকি ধর্মনিরপেক্ষ ও বামপন্থীরা ফাঁসির বিরোধিতা করছেন, তাদের আসল বক্তব্য, বেছে বেছে নাকি শুধু মুসলমানদেরই ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে। আফজল গুরু, কাসভ, ইয়াকুব প্রভৃতি। এতে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আতঙ্ক বোধ করছে। তাই ফাঁসি দেওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। এদের কথার সূত্র ধরেই কয়েকটি প্রশ্ন উঠে এসেছে। যেমন, টাইগার মেমন-সহ জাতীয়তাবিরোধী মুসলমানদের (ইয়াকুব মেমন-সহ) ষড়যন্ত্রের ফলে ১৯৯৩-এর ১২ মার্চ ধারাবাহিক ১৩টি বিস্ফোরণে ৩৫০ জনের মৃত্যু হয় এবং ১২০০ জন আহত হন। এই 'ব্লাস্ট' যে সকল পরিবারের প্রিয়জনদের ছিনিয়ে নিয়েছে, তাদের স্বজনহারা কান্নার শব্দ কি আপনাদের কর্ণকুহরে পৌঁছেছিল? সেই বিস্ফোরণে যাদের অঙ্গহানি হয়েছে বা 'ব্লাস্ট'-এর ক্ষত শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের বর্তমান অবস্থা কি একবার চাক্ষুষ করেছেন? এইভাবেই তো তাদের বাকি জীবনটা কাটাতে হবে। তাহলে আপনারা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশের প্রতি অনাস্থা দেখিয়ে মৃত্যুদণ্ড রোধে এত তৎপর কেন? ইয়াকুব ইসলাম মতাবলম্বী হওয়ার কারণে? দেশের নাগরিক হিসাবে আপনাদের সবারই তো তাদের বিরোধিতা করা উচিত— কিন্তু কোথায় কী? এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয়ত আরও একটা বিষয়েও প্রশ্ন পাশাপাশি উঠে আসছে। কাশ্মীরি মুসলমানদের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব হলেও সেই ভূখণ্ডেরই ভূমিপুত্র কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বিতাড়ন প্রসঙ্গে আপনারা চুপ কেন? তৃতীয়ত, হিন্দু সংগঠনগুলির প্রতি খড়্গহস্ত হলেও যেসকল মুসলমানেরা বিনা প্ররোচনা ছাড়াই আই এস-এ যোগ দিয়েছে বা দিতে যাচ্ছে তাদের বিরোধিতা করে একটি শব্দও খরচ করতে আপনাদের অনীহা কেন? চতুর্থত, মত প্রকাশের স্বাধীনতার মূলে আঘাত করে ফ্রান্সের সাপ্তাহিক 'শার্লে এবদো'-র অফিসে সন্ত্রাসী হামলার পরে নীরব রইলেন কেন? পঞ্চমত, বর্তমান বিশ্বে ত্রাসসঞ্চারকারী আইসিসের কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্য কি আপনাদের জানা আছে? ষষ্ঠত, কুয়েত কেন্দ্রিক আল জাজিরা চ্যানেলে আইসিসের বিজয় অভিযান নিয়ে সমীক্ষা সম্পর্কে কি আপনারা অবহিত?

আশঙ্কা হচ্ছে, আগের মতো এবারও হয়তো এইসব জনদরদি, মানবতাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রশ্নগুলি বৃথাই ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে। এরা হয়তো পেট্রডলারের লোভে অথবা বিজাতীয় ডিএনএ সংমিশ্রণের প্রভাবে চুপ থাকতে পারেন, কিন্তু এদেশের কোটি কোটি হিন্দুদের বিভ্রান্ত করতে পারেন না। আর তা যে পারবেন না ২০১৪ সালের নির্বাচনী ফলাফলই কি তার যথেষ্ট প্রমাণ নয়? কুলদীপ নায়ারও এই সত্যটিকে স্বীকার করে নিয়েছেন— নির্বাচনে জয়লাভের জন্য মুসলমানদের উপর নির্ভর না করলেও চলে।

সম্প্রতি আল-জাজিরা চ্যানেলের একটি সমীক্ষায় জানতে চাওয়া হয়েছিল— "Do you support the organizing victories of the Islamic State in Iraq and Syria?" (ইরাক ও সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের সংগঠিত জয়লাভকে আপনারা কি সমর্থন করেন, সমীক্ষায় যে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল তাতে দেখা যাচ্ছে ৮১ শতাংশেরও

> "আমাদের দেশের মহান ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিবাদী মানবাধিকার কর্মী, বিদ্বজ্জনদের শার্লে আবদোর ঘটনার পরে কোনো মৌন মিছিল বা মোমবাতি মিছিল করতে দেখা যায়নি। অথচ এই মিডিয়াই 'সূর্য নমস্কার'কে ঘিরে সমগ্র যোগ অনুশীলনকেই সাম্প্রদায়িক ও বিতর্কিত আখ্যা দিলেও আইসিসকে মহিমান্বিত করে 'উগলে আই এস কো নমস্কার' শিরোনামে খবর সম্প্রচার করতে কুণ্ঠা বোধ করে না।"

বেশি মুসলমান আইসিসের ঘৃণ্য কাজকে সমর্থন করছে। তাই কম সংখ্যক মুসলমানই সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত— এই তত্ত্বটি কি এখানেও খাটে? প্রথম সারির মিডিয়া ও এইসব বুদ্ধিজীবীরা প্রায়শই অভিযোগ করেন যে শান্তিপ্রিয় সংখ্যালঘু জনগণ (রাজনৈতিক নেতাদের কল্যাণে সংখ্যালঘু ও মুসলমান শব্দটি প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছে) হিন্দু সংগঠনগুলির জন্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অথচ কাশ্মীর উপত্যকায় শান্তির ধ্বজাধারীদের সন্ত্রাসকে ক্লিনচিট দিয়ে বসে থাকেন। সেক্ষেত্রে অবশ্য এরা যুক্তি সাজান চাকরির অভাব ও কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণই কাশ্মীরি মুসলমান যুবকদের বন্দুক হাতে তুলে নিতে বাধ্য করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে এটা ভুলে যান ৩৭০ ধারার ক্ষমতাবলে কাশ্মীরের মর্যাদা, ক্ষমতা ও অন্যান্য অনেক সুযোগ সুবিধা কাশ্মীরিরা পেয়ে থাকেন যা বাকি ভারতের মানুষ পায় না। অন্যদিকে পণ্ডিতরা তাদের বাসভূমি ছেড়ে নিজভূমে উদ্বাস্তু হয়েও হাতে অস্ত্র তুলে নেয়নি বা বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েনি— এটা দেখেও দেখেন না। বাংলাদেশ, পাকিস্তানে সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দু, খৃষ্টান ও কতিপয় বৌদ্ধদের উপর চলা অত্যাচার সম্পর্কে নীরব থাকলেও গাজা ভূখণ্ডে ইজরায়েলী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এরা অশ্রু বর্ষণ করতে ভোলেন না।

প্রকৃতপক্ষে, মূল সমস্যা হলো সশস্ত্র জিহাদ এবং অমুসলমানদের উপর মুসলমানদের একাধিপত্য স্থাপনে কোরানের শিক্ষা বা প্রভাব। এই কারণে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য, অত্যাধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত যুবক থেকে একদম সাদামাটা সাধারণ জীবনযাপনকারী অধিকাংশ মুসলমান যুবক আইসিসে যোগ দিতে ছুটে চলেছে, ভারতের বুকে গজিয়ে ওঠা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে যোগ দিচ্ছে। বৃটেনের উন্নত শিক্ষাদীক্ষা, জীবনধারায় প্রতিপালিত তিনজন বৃটিশ মুসলমান মহিলা তাদের নয়জন শিশুকে নিয়ে দু'মাস আগেই আইসিসের জেহাদে যোগ দিয়েছে। কানাডাতেও গত বছর দু'জন সৈন্য হত্যার ঘটনায় একজন সন্দেহভাজন আইসিস জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সুদূর দক্ষিণের মহাদেশ অস্ট্রেলিয়াও এদের নখরাঘাত থেকে বাঁচেনি। তাই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা আজ অনুসন্ধান করছে এমন কোন প্রেরণা যা হাজার হাজার যুবককে আইসিসে যোগদানে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। আই এস অধিকৃত অঞ্চলের ইয়াজিদি, কুর্দ, শিট এবং খৃষ্টান মহিলাদের উপর হওয়া দানবিক অত্যাচারের কথা জানা সত্ত্বেও কেন মুসলমান নারীরা আই এস-এ যোগ দিচ্ছে? এই অনুসন্ধানের কিছুটা নিরসন হয়তো হতে পারে পূর্বতন ইসলামিক মতাবলম্বী অলয়াস কিরমানির কথায়— "Muslim youths were joining IS because they want sex." পার্থিব জগতে কাফের নারী ও মৃত্যুর পর ৭২ জন হুরি ও কতিপয় গেলেমান--- মুসলমান যুবকদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে প্রলুব্ধ করলেও মহিলাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সামান্য পুণ্যলাভের আশা ছাড়া আর কিছুই নেই। কোরানের শিক্ষা বা প্রভাব যুব প্রজন্মকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এছাড়াও নাজমুদ্দিন কেলকর তথা বহু পরিচিত কুর্দিশ সুন্নি মুসলমান বিদ্বজ্জন মুল্লাহ্ ক্রেকারের মতো উগ্রবাদীদের মন্তব্য তো আছেই। ফ্রান্সের শার্লে এবদোতে আকস্মিক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের সাফাই গেয়ে মুল্লাহ বলেছেন, "The cartoonist has become an infidel in war and trampled on our dignity, our principles and belifs, so he must die. Anyone who does not respect 30 per cent of world's population has no right to live." বলাই বৃথা, এদের কাছে অমুসলমানদের প্রাণের কোনো দাম নেই। এমনকী আমাদের দেশের মহান ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিবাদী মানবাধিকার কর্মী, বিদ্বজ্জনদের শার্লে এবদোর ঘটনার পরে কোনো মৌন মিছিল বা মোমবাতি মিছিল করতে দেখা যায়নি। অথচ এই মিডিয়াই 'সূর্য নমস্কার'কে ঘিরে সমগ্র যোগ অনুশীলনকেই সাম্প্রদায়িক ও বিতর্কিত আখ্যা দিলেও আইসিসকে মহিমান্বিত করে 'উগলে আই এস কো নমস্কার' শিরোনামে খবর সম্প্রচার করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই খবরের উপস্থাপক হলেন একজন অহিন্দু। এই মিডিয়া যারা আই এম এফ প্রধানকে এক মুসলমান তরুণীর কর্তৃক যথার্থ সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের লাইভ টেলিকাস্ট দেখায় — "7.5 per-cent of inclusive growth.... Concentrated in Hindu male population." অথচ তারা কোনো মুসলমানকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে বলতে পারেন না— "Enough is enough and stop treating women as sex slaves in IS held areas."

পরিশেষে, একটা কথাই বলা যায়, আমাদের প্রয়োজন আত্মসমীক্ষার। ভাবতে হবে কেন ৮১ শতাংশ উত্তরদাতা আইসিসের গণহারে বীভৎস হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করছে? কেন ক্রেকার প্রকাশ্যে বলছে, যারা বিশ্বের ৩০ শতাংশ জনগণকে শ্রদ্ধা করে না, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই? তাই আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে, মিডিয়া বা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক সমালোচকদের কাছ থেকে উত্তরগুলো হয়তো সত্যিই পাওয়া যাবে না।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

প্রতিকপি ১০ টাকা

অন্য রকম

আত্মবিশ্বাসী সন্তোষ সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মানুষ লেখাপড়া শিখে প্রথমেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে ভালো এক চাকরির। উচ্চ শিক্ষালাভের সঙ্গে তার মনের বাসনাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। কিন্তু ভালো চাকরি পাওয়ার পরও যদি কেউ গোরু-বাছুর নিয়ে পড়ে থাকতে চান তাহলে কী বলা যায় তাঁকে? তবে আদৌ ব্যাপারটা তেমন কোনো বিশেষ চোখে দেখেননি সন্তোষ ডি. সিং। নিজের আগ্রহেই ডেয়ারি শিল্পে যোগদান বলে তাঁর যুক্তি।

ব্যাঙ্গালোর থেকে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েশন করে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় দশ বছর কাজ করেন সন্তোষ সিং। আমেরিকা অনলাইন, ডেল-এর মতো সফটওয়ার কোম্পানিতে চাকরি করতেন তিনি। চাকরি সূত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ঘুরে বেড়ানোর সুবাদে তিনি দেখেছেন মানুষ টাকা রোজগারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু যে কাজে মানসিক শান্তি আছে সেই কাজ করাই উচিত সকলের। টাকার পিছনে দৌড়তে গিয়ে মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে জলঞ্জলি দেন। এক্ষেত্রে সেটা না করাই উচিত বলে মনে করেন। তাই লক্ষাধিক টাকার মাসিক বেতনের কাজ ছেড়ে তিনি ডেয়ারি শিল্প গড়ে তুলতে তৎপর হন। যদিও সন্তোষ সিং-এর পরিবার তাঁর এই সিদ্ধান্তে সহমত পোষণ করেনি। কারণ কর্পোরেট জগতের চাকরি প্রত্যাখ্যান করাটা মেনে নিতে পারেনি তাঁর পরিবার। যদিও পরিবারের কথাকে আমল না দিয়েই তিনি ডেয়ারি শিল্প গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে ওঠেন। এই শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার তা কিছুই ছিল না তাঁর। অবশেষে তিনি ন্যাশনাল ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট সেন্টারে প্রশিক্ষণ নেন। এখানেই হাতে কলমে কাজ শিখতে থাকেন। এরপর চেন্নাইয়ের ডোড্ডাবল্লাপুরে তিন একর জমির উপর ডেয়ারি শিল্প গড়ে তোলেন। অমৃত ডেয়ারি ফার্মে প্রথমে তিনটি গোরুকে নিয়ে তাঁর ডেয়ারি ফার্ম শুরু হয়। এদের নিয়েই তাঁর দিন অতিবাহিত হোত। গোরুর দুধ দোওয়া, সময়ে খেতে দেওয়া, স্নান করানো, খাটাল পরিষ্কার করা সব কাজ তিনি নিজ হাতে করতেন। যা দেখে মনে হতেই পারে কোথায় ডেল, উইপ্রোর মতো কোম্পানির চাকরি আর এখন কিনা গোরুর পরিচর্যা করছেন!

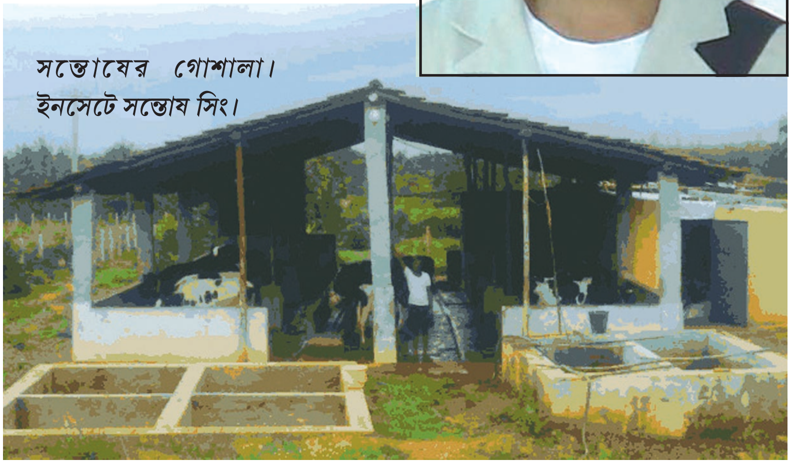

সন্তোষের গোশালা। ইনসেটে সন্তোষ সিং।

আসলে সন্তোষ সিং বেশি টাকা রোজগারের আশায় এই ফার্ম খুলতে চাননি। ভাল লাগার জায়গা জন্য এই ফার্ম গড়ে তুলেছেন বলে তাঁর দাবি। প্রথম বছরেই ২০টি গোরু নিয়ে আসেন এই ফার্মে। এন ডি আর ই-এর এক প্রশিক্ষক ডেয়ারি পর্যবেক্ষণে আসেন একদিন। তিনি সন্তোষ সিং-কে পরামর্শ দেন কীভাবে এই অমৃত ডেয়ারিকে আরও ভালোভাবে গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি বলেন, গোরুর সংখ্যা কমপক্ষে ১০০-এর বেশি করতে হবে। তাতে প্রতিদিন ১৫০০ লিটার দুধ উৎপন্ন হবে। দুধ বেশি উৎপন্ন হলে লাভ কম হলেও বিক্রির পরিমাণটা যেমন বাড়বে তেমনি ডেয়ারির আয়টাও সুনিশ্চিত হবে। পাশাপাশি গোবর দিয়ে সার উৎপন্ন হবে এবং গোবর গ্যাসও উৎপন্ন হবে। প্রশিক্ষকের কথা মতোই তিনি ১০০-এর উপর গো-পালন করতে শুরু করেন এবং বর্তমানে ব্যবসায় বছরে এক কোটি টাকার বেশি লেনদেন করেছেন। গত পাঁচ বছরে সন্তোষ সিং-এর ডেয়ারি শিল্পের ব্যবসায়িক উন্নতি যেমন হয়েছে তেমনি গোরুর সংখ্যাও ক্রমশ বেড়েছে। আত্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরি তাঁর এই ডেয়ারি শিল্প আজ অনেক সচ্ছল। আইটি সেক্টরের চাকরি ছেড়ে যখন ডেয়ারি খুলতে সচেষ্টা হলেন তখন হয়তো অনেকেই ভেবেছিলেন বেশিদিন তাকে এই ব্যবসা করতে হবে না। পুনরায় ফিরে যেতে হবে সেই তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায়। কিন্তু না, সকলকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে তিনি ডেয়ারি শিল্পেও সফলতা লাভ করেছেন। নাবার্ড নামক সংস্থার কাছ থেকে পুরস্কার বাবদ রৌপ্য পদকও লাভ করেছেন তিনি। বর্তমানে তিনিই অন্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন যাতে তারাও স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে এই ফার্ম শিল্পের মাধ্যমে। ▌

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

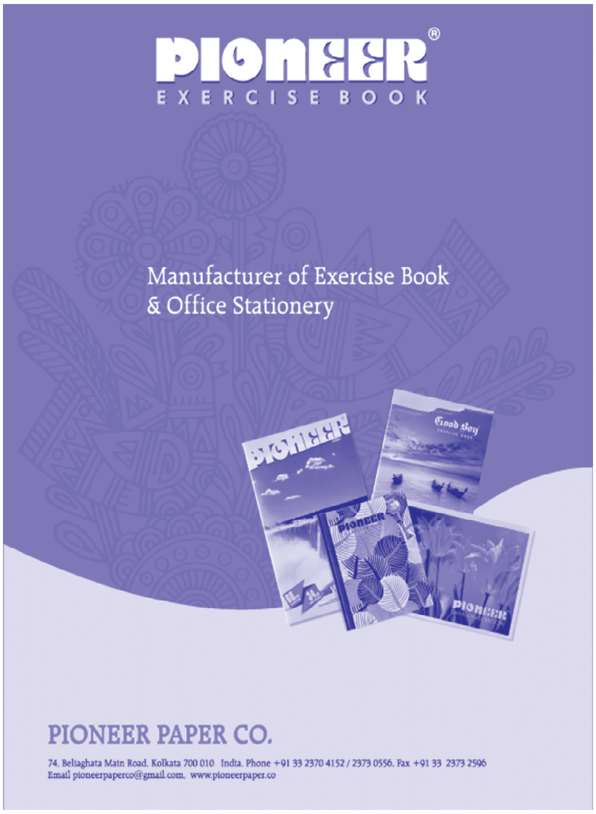

' পরিবর্তন যে হচ্ছে তাও ঠিক, নতুবা ভারতের অতীত কীর্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু নবলব্ধ বিদ্যার্জনের সঙ্গে পুরাতন গাম্ভীর্য এবং জ্ঞান যুক্ত থাকবে এবং তাও পবিত্রতা বর্জন করে কদাপি নয়। বৃহত্তর দায়িত্ব পবিত্র ভাবকে পবিত্রতর করবে। সুগভীর জ্ঞান নূতন, মহত্তর এবং কোমল ভাবসমূহের উৎসরূপ হবে। '

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

আলঝাইমার্স ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

আলঝাইমার্স রোগ হলো সবকিছু ভুলে যাওয়া। জার্মান সাইকিয়াট্রিস্ট অ্যালয়েস আলঝাইমার ১৯০৬ সালে স্মৃতি ভ্রংশ রোগের এই নামকরণ করেন নিজের নামে। এই রোগটি এমন, পায়খানা যাবে ভেবে রান্না ঘরে ঢুকে ভাবে এখানে কেন এলাম। শুধু তাই নয়, হাত ঘড়িটি কোথায় খুলে রেখেছে তা ভুলে যান। প্রিয় মানুষের নামও ভুলে যান। ডাক্তারি পরিভাষায় একে বলা হয় ডিমেনশিয়া। ডিমেনশিয়ার প্রধান লক্ষণ হলো স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি লোপ (ইন্টারলেকচুয়্যাল পারফরমেনস্ ইন এনি ফর্ম) পেতে থাকে। অথচ শারীরিক শক্তি, হাতে পায়ের জোর, ব্যালান্স ঠিক থাকে।

আলঝাইমার্স রোগের সঠিক কারণ পুরোপুরি জানা যায়নি। বিজ্ঞানীরা যে সমস্ত কারণগুলি চিহ্নিত করেছেন সেটি হলো—

- নিউরোট্রান্সমিটার উৎপাদন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া।
- নিউরোট্রান্সমিটার উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাওয়া।
- উৎপাদিত নিউরোট্রান্সমিটার অন্য কোনো রাসায়নিক দ্রব্যে দ্বারা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া।
- উৎপাদিত নিউরোট্রান্সমিটারের নিউরোন থেকে বের হওয়া পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া।
- এক নিউরোন থেকে বের হওয়া নিউরোট্রান্সমিটার পার্শ্ববর্তী নিউরোনের গ্রহণ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদি বহুবিধ কারণে নিউরোট্রান্সমিটার চলাচল বন্ধ হয়ে স্মৃতি সঞ্চালন ক্রিয়া থেমে যায়। এখানে উল্লেখ্য, নিউরোট্রান্সমিটার রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে নিউরোনের ভিতরে উৎপাদিত হয়।

অ্যাসিটাইল কোলাইন একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ নিউরোট্রান্সমিটার। দেহের অভ্যন্তরে উৎপাদিত কোলিনোস্টিরেজ উৎসেচক (Enzyme) অ্যাসিটাইল কোলাইন ধ্বংস করে দেয়। এই কারণে আলঝাইমার্স রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে অ্যাসিটাইল কোলিনোসিয়ারেজ উৎসকে ধ্বংসকারী ওষুধ খাওয়ানো হয়। আলঝাইমার্স রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর আক্রান্ত নিউরোন অথবা আক্রান্ত নিউরোনের চারপাশে কিছু অস্বাভাবিক বস্তু জমা থাকে। এই বস্তুকে নিউরোটিকপ্ল্যাক বলা হয় এবং নিউরোনের ভিতরের বস্তু অস্বাভাবিকভাবে পেঁচানো সুতো জাতীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। নিউরোটিক প্ল্যাক বিটা অ্যামলয়েড নামক প্রোটিন বস্তু দ্বারা গঠিত হয়। এই বস্তুটি ৪০টি বা আরও বেশি সংখ্যক আমাইনো অ্যাসিডের সংযুক্তিতে তৈরি হয়। প্রোটিঅ্যাসেস নাম উৎসেচক বিটা অ্যামাইলয়েড গঠনে সহায়তা করে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তাঁরা বলেছেন যে, বিটা অ্যামাইলেয়েডের উপস্থিতি নিউরোনের ভিতরের অ্যাসিস্টাইল কোলাইনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, জমানো বিটা অ্যামাইলয়েড নিউরোনের লোপ পাওয়া একটি কারণ হতে পারে।

আলঝাইমার্স-এর ধরন : দু'ধরনের আলঝাইমার্স ডিজিজ হয়। আর্লি অনসেট এবং লেট অনসেট। আর্লি অনসেটের ক্ষেত্রে ষাট বছর বয়স হওয়ার আগে আলজাইমার্স-এর লক্ষণ দেখা দেয়। লেট অনসেটের তুলনায় এর সংখ্যা কম, তবে যাঁদের ষাট বছরের নীচে আলঝাইমার্স হয় তাঁদের অসুখ দ্রুত হয়। সাধারণত এক্ষেত্রে পারিবারিক ইতিহাস থাকে। লেট অনসেট অর্থাৎ ষাট বছরের ওপরে যখন অসুখটি দেখা দেয়। এক্ষেত্রেও পারিবারিক ইতিহাস থাকতে পারে। তবে জিনের ভূমিকা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না।

আর্লি স্টেজ বা প্রাথমিক পর্ব : এই পর্বে খুব কম সময়ে অসুখ ধরা পড়ে। সাম্প্রতিক ঘটনা ভুলে যাওয়া। পরিচিত জায়গা চিনতে না পারা প্রভৃতি।

মিডল স্টেজ বা শেষ পর্ব : রোগী যখন পরিচিত আত্মীয়কে চিনতে পারে না। নিজের বাড়ি চিনে নেবার ক্ষমতা থাকে না। শেষে ব্লাডার এবং বাওয়েল নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

প্রতিরোধ : মধ্য বয়সের পরে দিনে কাপ তিনেক কফি খেলে অলঝাইমার্স হওয়ার আশঙ্কা ৬৫ শতাংশ কমে। জানা গেছে যাঁরা বেশি বয়স পর্যন্ত মেধা নির্ভর কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখেন তাঁদের আলঝাইমার্স হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। তবে কম ফ্যাট যুক্ত খাবার খাওয়া উচিত। মিষ্টি জলের মাছ খাওয়া ভাল। ভিটামিন-ই এবং ফল ও শাকসবজি জাতীয় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার খাওয়া উচিত।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : যে সমস্ত ওষুধ ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যায় সেগুলি হলো— স্ট্যামোনিয়াম, জিঙ্ক সালফ, জিঙ্ক ভ্যাল, জিঙ্কোবাইলোবা প্রভৃতি। তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। ■

ভারত পরিক্রমায় সন্ত সীতারাম কোচবিহারে

'ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামে বসবাস করে। গ্রাম্য সরল জীবন পুনরায় স্থাপিত হোক, গ্রামীণ সংস্কার, সংস্কৃতি, কৃষি বিকাশ করে তার সংরক্ষণ সংবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছ ভারত গড়তে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। কেননা গ্রামের বিকাশের মধ্যে দেশের বিকাশ নিহিত আছে'— এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজসেবী সন্ত সীতারামজী ২০১২ সালে ৯ আগস্ট সুদূর কন্যাকুমারী থেকে গ্রামভিত্তিক ভারত পরিক্রমা পদযাত্রা শুরু করেছেন। পশ্চিম ভারত, উত্তর ভারতের সীমা স্পর্শ করে বৈষ্ণবদেবী, চারধাম পরিক্রমা করে গত মার্চ মাসে উত্তরবঙ্গে চা বাগান এলাকা হয়ে গত ৩০ মার্চ অসমে প্রবেশ করেন। অসম এবং অরুণাচল প্রদেশের পরশুরামকুণ্ডু হয়ে গত ২৬ জুলাই উত্তরবঙ্গের বক্সিরহাটে প্রবেশ করেন।

অসম প্রান্তের শিলচরে অবস্থানকালে তাঁর পদযাত্রা এক হাজার দিন পূর্ণ হয়েছে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার জেলা অতিক্রান্ত হলে প্রায় ষোলো হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রান্ত হবে। কোচবিহার জেলার শালবাড়ি, নেপালের খাতা, মালগঞ্জ ও ঘুঘুমারি-সহ দশটি স্থানে তিনি অবস্থান করেন। মারুগঞ্জ থেকে ঘুঘুমারি আসার পথে রাস্তার দু'ধারে জনতার ঢল নামে। যাত্রাপথে হাজার হাজার দর্শনার্থী ফুল, উলুধ্বনি ও শাঁখ বাজিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। সন্ত সীতারাম উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক শ্রীধর কোঙার-কে জানান, এই যাত্রা বাংলাকে বিশেষভাবে নাড়া দেবে। উল্লেখ্য, এই ভারত পরিক্রমা দু'বছর পরে কন্যাকুমারীতে শেষ হবে।

মঙ্গলনিধি

মালদহ জেলার গাজোল শাখার স্বয়ংসেবক রামকমল মণ্ডল তাঁর পুত্র জয়ন্ত মণ্ডলের শুভবিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে গত ১৪ মে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রচারক মলয় দত্ত, মহকুমা কার্যবাহ জয়দেব সাহা, মহকুমা সম্পর্ক প্রমুখ নিখিল সাহা প্রমুখ।

শোকসংবাদ

মালদহ জেলার ৮ মাইল শাখার স্বয়ংসেবক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের জেলা সহ-সম্পাদক মন্টু সরকারের বাবা নরেন্দ্রনাথ সরকার গত ২৫ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

সমাবেশ সমাচার

হুগলীর জিরাটে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি স্থাপন

ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ১১৫ তম জন্মদিনে মহান শহীদের পূর্ণাবয়ব প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত হলো তাঁর পিতৃভূমি হুগলী জেলার বলাগড়ের জিরাটে। রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের প্রচেষ্টা ও শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতি সঙ্ঘ (জিরাট)-এর সহযোগিতায় গত ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদের প্রস্তর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতির মধ্যে এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজ্যপাল স্বয়ং এবং ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য-সভাপতি রাহুল সিনহা ও অন্যান্য বক্তা। নানা গুণীজন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। গত ২৩ জুন এই স্থানে ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর বলিদান দিবস উপলক্ষে দাতব্য চক্ষু পরীক্ষা ও ছানি সনাক্তকরণ শিবির হয় পশ্চিমবঙ্গ রোটারি নারায়ণ নেত্রালয় সল্টলেক কলকাতার উদ্যোগে এবং গত ৫ জুলাই একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষার আয়োজন করা হয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর বীরভূম জেলার সন্ধিগড়া বাজার শাখার স্বয়ংসেবক তরুণ কুমার মণ্ডলের বাবা নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল গত ১৯ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর বীরভূম জেলার রামপুরহাট নগর সঙ্ঘচালক উৎপল চ্যাটার্জীর বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ চ্যাটার্জী গত ২৯ জুন পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি স্ত্রী ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল স্মরণ অনুষ্ঠান

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের প্রতিফলন পড়েছিল পত্র-পত্রিকা, সাহিত্য, গানে ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামে। তাঁর স্বল্প জীবনকালে (১৮৩৮-১৮৮৪) তিনি বাংলার সমাজ জীবনে ও রাজনীতিতে এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁকে 'মহারাণীর বিরোধী পক্ষের নেতা' (Her Majest's opposition) বলা হোত। হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক (১৮৬২ থেকে আমৃত্যু) ও বৃটিশ ইন্ডিয়ান সমিতির সম্পাদক হিসাবে জাতীয় স্বাধিকারের প্রবক্তা ছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতে 'হোমরুল' প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। কলেজ স্ট্রিট ও মহাত্মা গান্ধী রোডের সংযোগস্থলে তাঁর মর্মরমূর্তি কৃষ্ণদাস পালের অক্ষয় কীর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জাতীয় জীবনের বিবেক ছিলেন তিনি। সমকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী যেমন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ'র সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শেও এসেছিলেন এই বরেণ্য মানুষটি। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বহুমাত্রিক অবদানের কথা তুলে ধরেন কৃষ্ণদাস পালের ১৩১তম প্রয়াণ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ স্টেট আর্কাইভস-এর প্রাক্তন অধিকর্তা ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রদত্ত স্মরক বক্তৃতায়।

গত ২৪ জুলাই বাংলা আকাদেমির জীবনানন্দ সভাগৃহে স্মরণ সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল স্মৃতি সংসদ ও লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতির যৌথ উদ্যোগে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমবাজার রামকৃষ্ণ মঠের সম্পাদক স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ। পৌরহিত্য করেন রমেশ পুরকায়স্থ (সভাপতি লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতি)। অনুষ্ঠান শেষে কবিতা পাঠে অংশ নেন বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিনের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজন কবি।

কলিগ্রামে সংস্কার ভারতীর নটরাজ পূজা

গত ১৯ জুলাই মালদহ জেলার কলিগ্রাম সংস্কার ভারতী শাখার উদ্যোগে জয়দেব দাসের বাড়িতে নটরাজ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন চন্দন সেনগুপ্ত, কলিগ্রাম সংস্কার ভারতী শাখার সভাপতি শ্রীমতী দেবী রায়চৌধুরী, সম্পাদক জহর কুণ্ডু, অশেষকৃষ্ণ গোস্বামী ও কলিগ্রাম শাখার শিল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সংস্কার ভারতীর ভাবসঙ্গীত-সহ দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন শিল্পীবৃন্দ।

***

নদীয়া জেলার দেবগ্রাম শাখার স্বয়ংসেবক মানস রায়ের মাতৃদেবী গীতা রাণী রায় গত ১০ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বৎসর। তিনি চার কন্যা ও এক পুত্র রেখে গেছেন।

With Best
Compliments
from -

A
Well Wisher

উত্তরদিনাজপুরের চাকুলিয়ার শিরসী গ্রামে মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত বনবাসীদের বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পক্ষে গত ৩১ জুলাই থেকে বস্ত্রদান করা হয়। ছবিতে বস্ত্রদান করছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বাসুদেব পাল। উল্লেখ্য, স্থানীয় বিডিও-র পক্ষ থেকে প্রত্যেক পরিবারকে ত্রিপল ও খাট দেওয়া হয়।

থাকে যদি
'ডাটা,'
জমে যায় রান্নাটা
ডাটা®
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
Krishna Chandra Dutta (Cookme) Pvt. Ltd.
DUTA
50g
TURMERIC
FRESH N' PURE
POWDER
কেনার সময় অবশ্যই
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী)
প্রাইভেট লিমিটেড
নাম দেখে তবেই কিনবেন
CHILLI
POWDER
Kasuri Methi
pure
INDIAN
SPICES
Krishna Chandra Dutta
(Cookme) Pvt. Ltd.
207 Maharshi Debendra Road,
Kolkata 700007
email : dutaspice@gmail.com

উইম্বলডন, ডেভিসকাপে ভারত উদয়

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃটিশ আভিজাত্য ও রাজকীয় জাত্যাভিমানের আঁতুড়ঘর 'অল ইংল্যান্ড ক্লাবের' সেন্টার কোর্টে সত্যিই ভারত উদয় দেখা গেল। উইম্বলডনের ১২৫ বছরের ইতিহাসে যা কোনোদিন হয়নি এবছর লিয়েন্ডার পেজ, সানিয়া মির্জা ও সুমিত নাগালের দৌলতে 'শাইনিং ইন্ডিয়া' যেন প্রতিফলিত হলো। একই সঙ্গে ত্রি-মকুট জয় ভারতীয় টেনিসের গৌরবময় অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতের এক উজ্বল দিকচিহ্ন রচনা করে দিয়ে গেল। যত বয়স বাড়ছে লিয়েন্ডার যেন আরো ক্ষিপ্র হচ্ছেন, নতুন করে সংকল্প নিয়ে গ্র্যান্ডস্লামে আসছেন। ঠিক যেন রজার ফেডেরারের কার্বন কপি। ফেডেরার মধ্য তিরিশেও উইম্বলডন ফাইনালে উঠেছেন, শেষ পর্যন্ত লড়ে তবেই লোভাক জাকোভিচের কাছে হার স্বীকার করেন।

সানিয়া মির্জা

পরপর দু'বছর ফেডেরার উইম্বলডন ফাইনালে উঠে 'জোকারের' হাতে বধ হলেন। সাতটি উইম্বলডন সহ ১৭টি গ্র্যান্ডস্লামের মালিক মনে করেন তাঁর আরো গ্র্যান্ডস্লাম জেতার ক্ষমতা আছে। ভেতরের আগুনটা এখনো নিভে যায়নি। আর একবার উইম্বলডন জিতলেই পিট সাম্প্রাসের রেকর্ড ভেঙে নতুন মাইলফলক স্থাপন করবেন। সব মিলিয়ে গ্র্যান্ডস্লাম জয়ের নিরিখে কিংবদন্তী অস্ট্রেলিয়ান রয় এমারসনকে টপকে গেছেন। ঠিক তেমনি লিয়েন্ডারও ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস মিলিয়ে ১৬টি গ্র্যান্ডস্লাম জিতে ফেলেছেন। উইম্বলডন খেতাব আটটি, যার মধ্যে মহেশ ভূপতিকে নিয়ে একবার চ্যাম্পিয়ন। এ পর্যন্ত একশোজনের সঙ্গে তাঁর ডাবলস খেলা হয়ে গেল, এটাও এক অনন্য নজির।

লিয়েন্ডারের কাছে উইম্বলডন খেতাব অবশ্য নতুন নয়। সানিয়া মির্জা এবারেই প্রথম উইম্বলডন জিতেছেন। কাকতালীয়ভাবে লিয়েন্ডার ও সানিয়া দু'জনেরই পার্টনার অভিন্ন। সুইজারল্যান্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা

লিয়েন্ডার পেজ

টেনিস তারকা মার্টিনা হিঙ্গিসকে পেয়ে লিয়েন্ডার ও সানিয়া যে যথেষ্ট উপকৃত তা বারে বারে স্বীকার করেছেন দু'জনে। অন্যদিকে হিঙ্গিসও ভারতীয়দের সঙ্গে ডাবলস খেলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এটা তার ভারত প্রেমেরই প্রতিফলিত রূপ। গত বছর ভারত সফরে এসে এদেশের কৃষ্টি, দর্শনীয় স্থানমাহাত্ম্য অন্তর থেকে অনুভব করেছিলেন। এদেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হিঙ্গিস তাই কোর্টে লিয়েন্ডার ও সানিয়ার মধ্যে সেই সনাতন ভারতীয়ত্বকেই খুঁজে পান।

লিয়েন্ডারের ২৫ বছর আগে সিঙ্গলসে জুনিয়র উইম্বলডন খেতাব জেতার কৃতিত্ব রয়েছে। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে উঠে আসা সুমিত নাগালও ভিয়েতনামের সঙ্গীকে নিয়ে ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভবিষ্যতের তারকা হয়ে ওঠার ইঙ্গিত বহন করছেন। সোমদেব দেববর্মন, যুকি ভাম্বরির পর সুমিত ডেভিসকাপে ভারতের পতাকা বহনের গুরুদায়িত্ব পাবেন। টেনিসের দলগত বিশ্বকাপ ডেভিসকাপে ভারতের রেকর্ড নেহাত ফেলনা নয়। তিনবারের ফাইনালিস্ট ভারত লিয়েন্ডার, মহেশের হাত ধরেও অনেক স্মরণীয় জয় পেয়েছে। তবে গত কয়েকবছর ডেভিসকাপে সেই ভারতকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এবছর অবশ্য খানিকটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে। নিউজিল্যান্ডে গিয়ে চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে যেভাবে 'কিউই' সংহার করে এলেন ভারতীয়রা, তা দেখে আশায় বুক বাঁধছে টেনিসপ্রেমীরা।

সামনের মাসে দিল্লীতে ওয়ার্ল্ডগ্রুপ প্লে অফ টাইয়ে ভারত মুখোমুখি হবে চেক প্রজাতন্ত্রের। খাতায়-কলমে চেকরা ভারতের থেকে শক্তিশালী। যে দলে প্রাক্তন গ্র্যান্ডস্লাম ফাইনালিস্ট টমাস বার্ডিচের মতো মহাতারকা আছে, তাদের বিরুদ্ধে ভারত আন্ডারডগ হিসেবেই শুরু করবে। তবে দিল্লীর গরম আর হার্ড কোর্ট চেকদের সমস্যায় ফেলতে পারে। ওই টাইয়ে লিয়েন্ডার থাকবে। রোহন বোপান্নার সঙ্গে ডাবলসে লিয়েন্ডারের খেলা মানে বিপক্ষ শিবিরে একটা সম্ভ্রমের বাতাবরণ তৈরি হওয়া। তবে সিঙ্গলসে সোমদেব, যুকিকে শতকরা ২০০ ভাগ দিতে হবে। চেকরা র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকলেও ডেভিসকাপে র‍্যাঙ্কিং বিচার্য বিষয় নয়। লিয়েন্ডার সেটা বারে বারে প্রমাণ করে দিয়েছেন। সোমদেবও অতীতে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে বড় ম্যাচ জিতেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ টাইয়ে চেকদের হারিয়ে ভারত আবার বেশ কয়েকবছর পর ওয়ার্ল্ড এলিট গ্রুপে ফিরে আসতে পারে। সোমদেব, যুকি যদি একটা করে সিঙ্গলস জিততে পারে, তাহলে সামনের বছর আবার ভারতকে দেখা যেতে পারে বিশ্বমঞ্চে। ■

শব্দরূপ-৭৫৮ শ্যামাপ্রসাদ দাশ

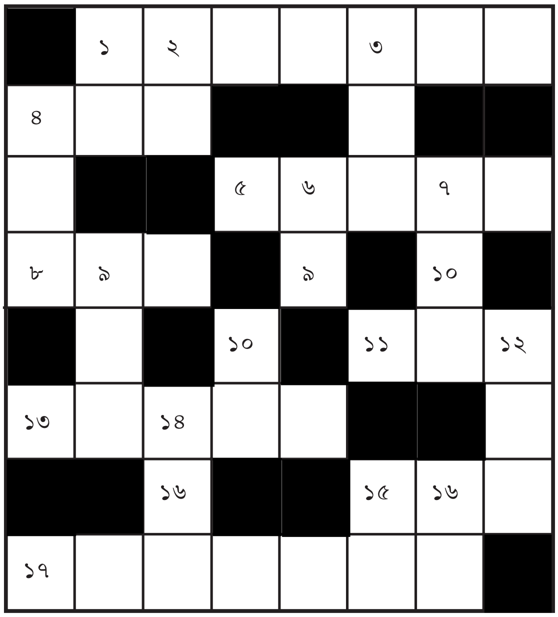

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** বাগধারায় অত্যন্ত সৌভাগ্য, **৪.** বিয়েবাড়িতে বাজে, **৫.** ব্যঙ্গে উপবাস, **৮.** সন্ন্যাসীদের বসন, **১১.** সিংহাসন, **১৩.** বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রণেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, **১৫.** ঢং, গুমর, **১৭.** অভিনেতা দেবের প্রকৃত নাম।

উপর-নীচ : **১.** শরবত, **২.** সীমা, কূল, **৩.** চূড়ান্ত, মৃত্যুকালীন, **৪.** জামসেদপুরের সাবেকিনাম, **৬.** আঁশবিহীন মাছ, **৭.** প্রতিযোগিতা, **৯.** ছাগী, **১০.** সোনা বা রুপোর তৈরি বড় দানা, **১২.** মাছ, হরিণ, হ্রদ, **১৪.** প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাবিদ, **১৫.** গানে তবলার গৎ, **১৬.** করে এমন।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৫৫
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

	কৃ	ত্তি	বা	স		জ	না
গী	ত		জ	রু		য়	
তা	ক			চা		দ্র	
	পু		প্রা	ক	ক	থ	ন
গো	ত্র			লি	পি		ন্দ
রা		বে					
	অ	ঘো	র	প	স্থী		পু
		র		থ্য			রু

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

৭৫৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

ARE YOU SEARCHING FOR A PROPERTY PLANNER ?

PROPERTY

BUY SALE RENT

Contact
DILIP KUMAR JHAWAR 9831172945
RANAJIT MAZUMDAR 9339861465

S M WEALTH INFRAREALTOR LLP | 52 /E BALLYGUNGE CIRCULAR ROAD, KOLKATA 700019
Email : info@smwealth.co | Web Link : www.smwealth.co

স্যার আশুতোষ মুখার্জীর সার্ধশতজন্মবর্ষে জাতীয় আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আগামী ১৩-১৪ আগস্ট, স্যার আশুতোষ মুখার্জীর সার্ধশতজন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি জাতীয় আলোচনা সভা হতে চলেছে। ‘বাংলার বাঘ’ হিসাবে বিখ্যাত ‘আশুতোষ মুখার্জীর জীবন ও কর্ম’— এই সভার আলোচ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার পরিসরে বোস ইনস্টিটিউট মেন অডিটোরিয়াম ও মেঘনাদ সাহা অডিটোরিয়ামে এই সভা হবে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি, কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. হর্ষবর্ধন, রাজ্যের মন্ত্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এই আলোচনা সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগ, বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশন, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স এবং বোস ইনস্টিউট সম্মিলিতভাবে এই আলোচনা সভার উদ্যোক্তা। সকাল ১১ টায় এই জাতীয় আলোচনা সভার শুভ সূচনা হবে।

‘পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়—বিচার দর্শন’ গ্রন্থসমগ্র উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২৮ জুলাই বিকালে পণ্ডিত ‘দীনদয়াল উপাধ্যায়—বিচার দর্শন’ গ্রন্থসমগ্রের উন্মোচন অনুষ্ঠান হলো। যদিও বাংলাভাষায় অনুদিত প্রথম খণ্ডটির উন্মোচন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত ইতিপূর্বেই করেছেন। এই গ্রন্থটির বিষয় ছিল তত্ত্বজিজ্ঞাসা। বাংলা ভাষায় অনুদিত অন্যান্য খণ্ডের বিষয়বস্তু, যেমন ২য় খণ্ড— একাত্ম মানবদর্শন (বিস্তৃত ব্যাখ্যা), ৩য় খণ্ড— রাজনৈতিক চিন্তন, ৪র্থ খণ্ড— একাত্ম অর্থনীতি, ৫ খণ্ড— রাষ্ট্রের অবধারণা, ৬ষ্ঠ খণ্ড— রাষ্ট্রের জন্য রাজনীতি, ৭ম খণ্ড— ব্যক্তি দর্শন এবং ৮ম খণ্ড— বিবিধ প্রসঙ্গ। এই ৮টি খণ্ডে ৯০টি বিষয়ের আলোচনা রয়েছে। উৎসাহী পাঠকেরা ২৬, বিধান সরণি, কলকাতা-৬, শ্রীঅরবিন্দ দাশ (৯৪৩২৪৩৫৫৫৬)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

জনবিস্ফোরণের পথে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রকাশিত ‘ওয়ার্ল্ড পপুলেশন প্রসপেক্টস্ : দ্য ২০১৫ রিভিশন’ শীর্ষক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে, ২০২২ সালে মধ্যেই জনসংখ্যার ক্ষেত্রে ভারত চীনকে টপকে প্রথম সারিতে চলে আসবে। সমগ্র বিশ্বে চীন এবং ভারতেই ১ বিলিয়নেরও অধিক বসবাসকারী মানুষ বিশ্ব জনসংখ্যার যথাক্রমে ১৯ শতাংশ ও ১৮ শতাংশ দখল করে রয়েছে। ২০৫০ সালের মধ্যেই ছ'টি দেশ যথাক্রমে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যা ৩০০ মিলয়ন ছাড়িয়ে যাবে। আগামী কয়েক দশকের মধ্যে সেই জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ জুড়ে থাকবে বয়স্ক ব্যক্তিরা। ২০৫০ এর মধ্যেই ইউরোপেই মোট জনসংখ্যার ৩৪ শতাংশ হবে ষাটোর্ধ্ব লোক। ল্যাটিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান ও এশিয়াতেই ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তির সংখ্যা বর্তমানে ১১ শতাংশ থেকে বেড়ে ১২ শতাংশ হলেও ২০৫০ এর মধ্যে এই শতাংশের হার বেড়ে দাঁড়াবে ২৫ শতাংশ। বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা ৭.৩ বিলিয়ন যা ২০৩০-এ বেড়ে দাঁড়াবে ৮.৫ বিলিয়ন এবং এই শতাব্দী শেষ ২১০০-তে হবে ১১.২ বিলিয়ন।

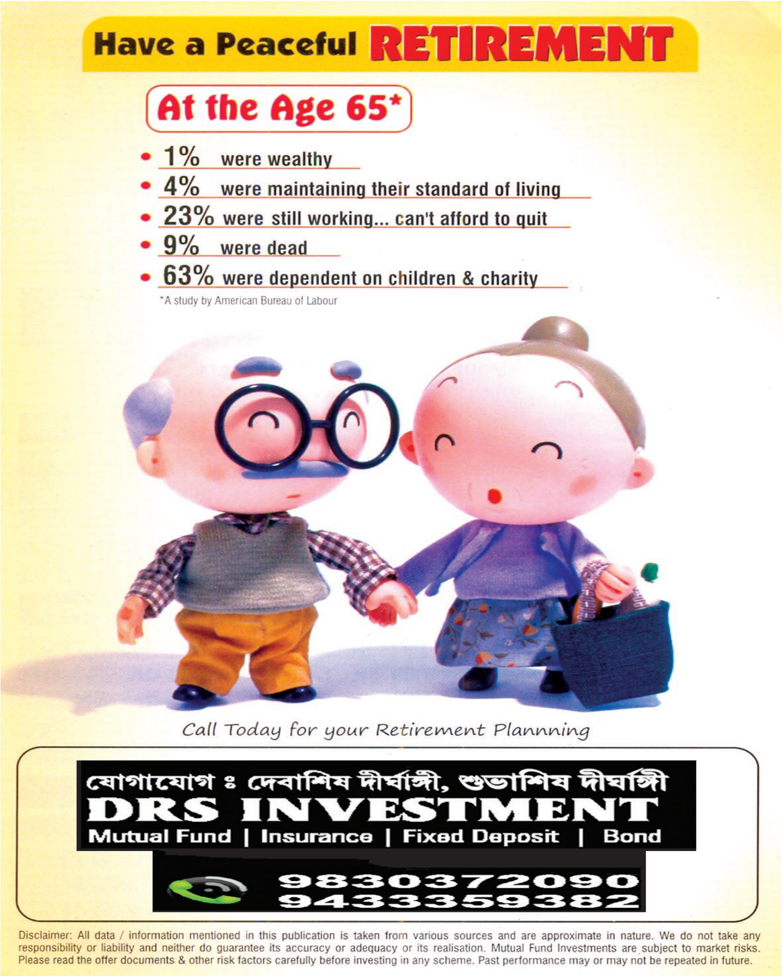

At Sarda, we believe that forests and plywood can co-exist. Our plywood makes products using only half the volume of sawn timber. We are also FSC certified using timber sourced from only sustainable managed forests.

So the next time you sit on a chair made of our plywood, you will feel more comfortable knowing you have made a small contribution towards saving a forest.

The Forest Friendly Company

OUR BRANDS

DURO TITANIUM LASTS FOREVER
DURO NATURE SIGNATURE
Durobord
DURO TECHPLY PLYWOOD • BLOCKBOARD ENGINEERED TO PERFECTION
DURO Pumaply ALL WEATHER PROOF PLYWOOD
SARDA DUROTEAK TEAK DECORATIVE PLYWOOD
DUROFLEX PREMIUM FLEXIBLE PLYWOOD
DURODOOR ELEGANCE

Sarda Plywood Industries Ltd.
Toll Free No. 1800-345-3876 (Duro) 10am - 6pm Monday-Friday, www.sardaplywood.in